নভেম্বর-ডিসেম্বর
২০২১

হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের দ্বিমাসিক বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন

হোয়াইট অরিজিন্স

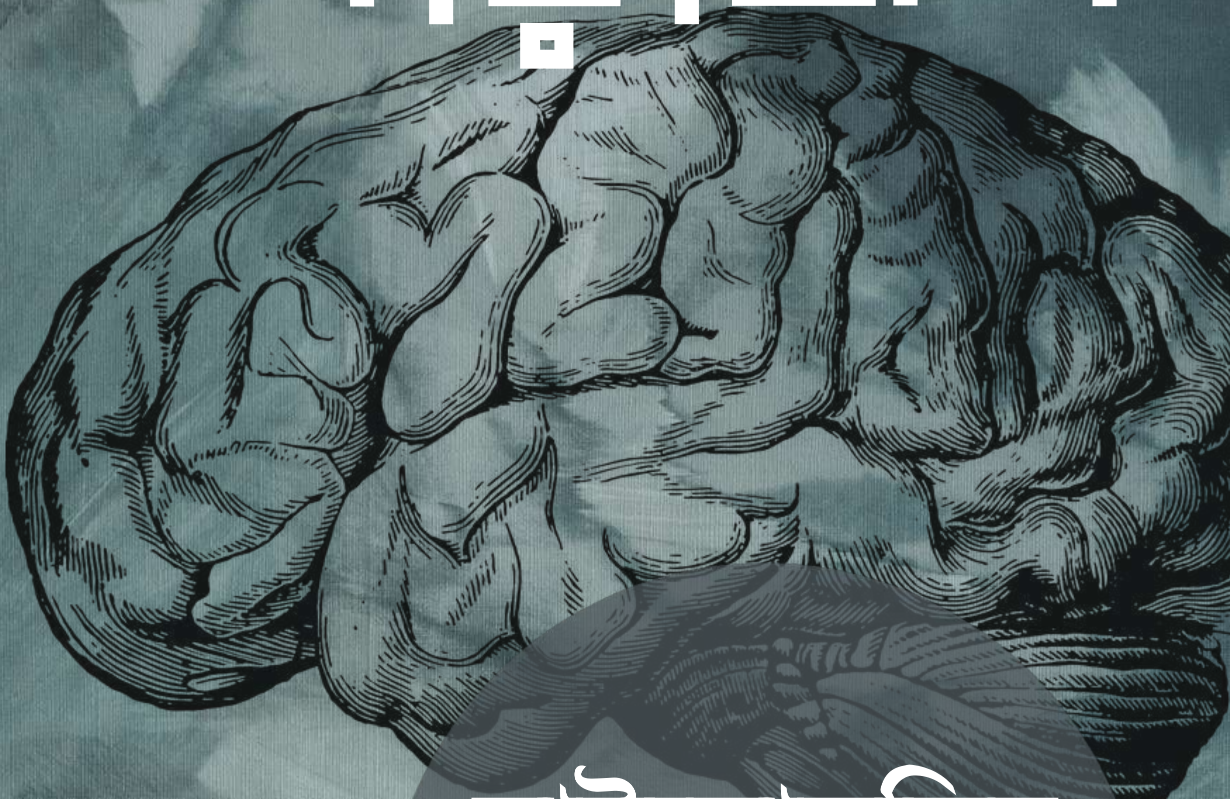

সাইকোলজির আদ্যোপান্ত

মনোবিজ্ঞান

- টেরারিয়াম এ তৈরি ছোট্ট এক পৃথিবী
- সিনড্রোমস্ ও মিথস্
- মাল্টিভার্স
- ইন্টারন্যাশনাল রোবোটিক্স অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক বিজয়ীদের সাক্ষাৎকার
- বিজ্ঞানছড়া, কি, কেন ও কিভাবে, বিজ্ঞান বুলেটিন, ফিচার আর্টিকেলসহ আরো অনেক কিছু!

সম্পাদকের ডাইরি থেকে

knock knock knock!

বেশ লম্বা একটা সময় পর আবারও আমরা হাজির তোমাদের প্রিয় ম্যাগাজিন হোয়াইট অরিজিন্স নিয়ে। ইতিমধ্যেই তোমরা করোনাকাল পার হয়ে স্কুল বা কলেজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করেছো, আর ফিরেই হয়ত এতদিনের জমে থাকা পড়া আর একগাদা পরীক্ষার চাপে 'ডিপ্রেসড' হয়ে আছো। তাই এরকমই এক সময়ে বদ্ধ ঘরে খোলা জানালার মতো দখিনা হাওয়া নিয়ে হোয়াইট অরিজিন্সসহ আমরা হাজির তোমার কাছে, তোমার সময়টাকে একটু মজাদার করে তুলতে।

এবারের সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি নানা রকমের সাইকোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও ডিপ্রেশন সম্পর্কিত চমৎকার কিছু ফিচার নিয়ে। এক নিমিষে পড়ে ফেলার মতো সাইলিট, কৌতূহলোদ্দীপক বেশ কিছু আর্টিকেল, স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিজ্ঞানজগতের নানা আপডেট, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন খুঁটিনাটি কারসাজির গল্প নিয়ে সাজানো এবারের হোয়াইট অরিজিন্সের সাথে তোমার সময়টা যে মন্দ যাবে না সেটা বলার অপেক্ষাই রাখে না। এছাড়াও ম্যাগাজিনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মজার মজার মিম। সাথে আরও থাকছে এ বছর আন্তর্জাতিক রোবটিক্স অলিম্পিয়াড জয় করে আসা ইনান ও তার বোন জাইমার স্বপ্নযাত্রার গল্প!

হোয়াইট অরিজিন্সের প্রথম সংখ্যা নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ সাড়া পেয়েছি আমরা, তাতে হোয়াইট অরিজিন্স টিম সত্যিই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ। আশা করছি, এবারের সংখ্যাটিও তোমাদের ভালো লাগবে। তোমাদের বন্ধুদেরও ভালো লাগতে পারে, তাদেরকেও জানিয়ে দিও। আর ম্যাগাজিন নিয়ে তোমাদের যত্ত প্রশ্ন বা সাজেশন্স আছে সব আমাদেরকে পাঠিয়ে দিও ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে। আমরা থাকবো তোমাদের মেইলের অপেক্ষায়। তোমাদের সাজেশন্সগুলো মাথায় রেখে সামনের ম্যাগাজিনগুলোতে আরও ইমপ্রুভমেন্ট আনার চেষ্টা করব আমরা ইনশাআল্লাহ। আর হ্যাঁ, ম্যাগাজিনের সামনের সংখ্যাগুলোতে কিন্তু তোমরাও লেখা দিতে পারবে। খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে নোটিশ চলে আসবে হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের ফেসবুক পেইজে। নিয়মিত আপডেট পেতে ক্লাবের পেইজ লাইক ও ফলো করতে ভুলো না যেন!

তাহলে আর দেরি কেন! কম্বলের ভিতর পা গলিয়ে হাতে থাকা ইলেকট্রনিক ডিভাইসটিতে ম্যাগাজিনের পাতা উলটানো শুরু করে দাও আর হারিয়ে যাও বিজ্ঞানের ভুবনে!

সামনের দিনগুলোর জন্য শুভকামনা রইলো সকলের প্রতি!

- সম্পাদনা পরিষদ
হোয়াইট অরিজিন্স দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচিপত্র

মূল আকর্ষণ
সাইকোলজির আদ্যোপান্ত

বর্তমান সময়ে একদিকে যেমন করে বাড়ছে শিল্পায়ন ও নগরায়নের উত্তরোত্তর ব্যাপকতা, একই প্রেক্ষিতে তাল মিলিয়ে সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানান মানসিক সংকট। কবিগুরুর ভাষ্যমতে "ইটের ওপর ইট, তারই মধ্যে কীট"; সেখানে মনের খোঁজখবর রাখবার ফুসরত-ই বা কই?

কেউ কোথাও ভালো নেই যেন সেই ১৮
ফোবিয়াঃ অমূলক ভীতির আদ্যোপান্ত ২২
ঘুমের মনস্তত্ত্ব ২৮
আত্মশুদ্ধির পথে আত্মবিসর্জন ৩২

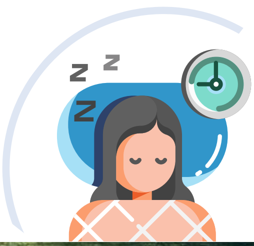

১৪ কেমন বোকা মনটা রে!

ম্যাগাজিন টিম

সম্পাদনা পরিষদ
সাদিয়া সুলতানা
আব্দুর রহমান
মোহাম্মদ আইমান আওসাফ
মাহির আজরফ
অংকন দে অনিমেষ
সাঈদ খান সাগর

নির্বাহী সম্পাদক
সাদিয়া সুলতানা

ডিজাইন প্রধান
মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী

ডিজাইন সহকারী
মো. ফাইজুল কবীর জিশান
নূরে ওয়াকিয়া
মো. সাজিদুল ইসলাম
আব্দুর রহমান
ইশমাম আকিব
আঈশা নূর
হিমাদ্রী দে
জাবেদ মাহমুদ

প্রচ্ছদ
মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী

শুভকামনায়
ড. আদনান মান্নান
সাইফুদ্দিন মুন্না
ড. মঞ্জুরুল কিবরিয়া

সূচিপত্র

সাইলিট

প্রেয়সীর পৃথিবী ০৬

বৃষ্টিভেজা এক সকাল। রবিবার, ছুটির দিন। ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়ছে রেমন্ড ও জেসিন্ডা। হুট করেই রেমন্ড বলে, "তোমার ছাতা রেখে আসো, দুজন এক ছাতার নীচেই থাকি আজ।"

বিজ্ঞানের জগতে একদিন ১১

বৈজ্ঞানিক লেখালেখি

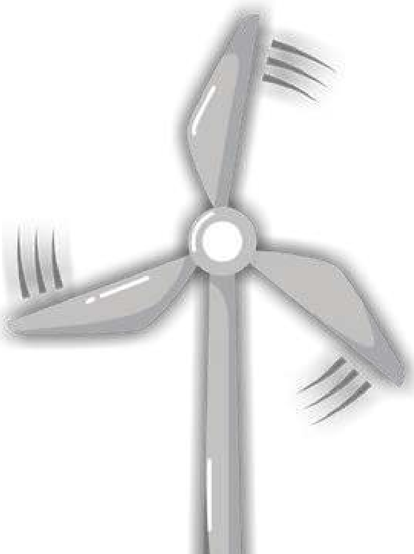

বিশেষ ধন্যবাদ
ফারিহা রাইসা
সায়মা সুলতানা
রিনভি নুসরাত

পরিমার্জনা ও পুনলিখন
আঈশা নূর
চৌধুরী মুহাম্মদ শাফকাত
আফরোজা সুলতানা মনি
নাবিলা আফনান
হালিমা সামিয়া
তাসমীম ফাবীহা লাবণ্য
হাসপিয়াত তোরাবী
নাজিফা গওহার
হৃদিকা বিশ্বাস
হিমাদ্রী দে

একাডেমিক নেতৃত্ব
আরিফ আবরার নাঈম
আঈশা নূর
নূরে ওয়াকিয়া

মিমস্
রাগিব মাজেদ চৌধুরী
আঈশা নূর

সম্পাদনা ও প্রচার
অংকন দে অনিমেষ
মোহাম্মদ আইমান আওসাফ
মুহাম্মদ জাওহার চৌধুরী
মো. ফাইজুল কবীর জিশান
আরিফ আবরার নাঈম
ক্লাব জেনারেল মেম্বারস

প্রকাশনা ও সত্ত্ব
হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাব
(সংবিধান অনুযায়ী স্বত্ব প্রযোজ্য হবে)

সিনড্রোমস্ ও মিথস্ ২৫
মাল্টিভার্স ৪০

নিয়মিত

বিজ্ঞান বুলেটিন ৩৪
কি, কেন ও কিভাবে ৪২
স্বপ্নজয়ের যাত্রা ৫১
আপনি কি জানেন? ১৩ ও ৪১

এছাড়াও রয়েছে বিজ্ঞানীদের জন্মদিন, নানা দিবস, সাই-মিমসসহ অনেক কিছু!

ক্লাব পরিচালক
রক্তিম বড়ুয়া

ক্লাব সহকারী পরিচালক
সোহেল বড়ুয়া

বিশেষ ভূমিকায়
সামিহা আফসারা ইবনাত
এনামুল হক জুয়েল
ওমর ফারুক
হিমাদ্রী দে
তাসফিয়া আলিম
নাবিলা আফনান
পূজা ধর পায়েল
জয়িতা মিত্র
তামজিদ আজাদ
আদিলা মির্জা
অনুভব রুদ্র
ইপা ঘোষ
অপূর্বা চৌধুরী
নাবিল বিন সাঈদ
খাদিজা কাদের হিমা
সিদরাতুল মুনতাহা ছানিয়া
তনিমা দত্ত
ফারজানা সুলতানা
মিশকাতুল সাইমা হক
জান্নাতুল মাওয়া মুক্তি
মুহাম্মদ আল আরমান
মাইশা ফাহমিদা
মুহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দিন
নাফিস আল আরেফিন
পিয়ালি পাল কথা
রাইদা রাফা
তালহা বিন তাহের
তানভীর আজিজ মাহি
মিনহাজুল করিম চৌধুরী
উম্মে সাদিয়া

সাইলিট

কী এই সাইলিট? একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এটার অর্থ হচ্ছে সায়েন্স লিটারেচার, মানে হচ্ছে বিজ্ঞানের সম্পর্কিত সাহিত্যের যেকোনো রূপ। যারা এই লাইন পড়ে কনফিউজড, ওদের কে দ্রুতই বুঝাচ্ছি! সায়েন্স ফিকশন তো পড়েছ আশা করি? সায়েন্স ফিকশন একরকম সাহিত্য যেহেতু সেটা ফিকশন বা কল্পকাহিনী, আবার একই সাথে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত! এর অর্থ সায়েন্স ফিকশন পড়বে এই "সাইলিট" ক্যাটাগরিতে। শুধু কী এটাই? একদমই নাহ! সাইলিট ছাড়াও থাকতে পারে সায়েন্স বিষয়ক পয়েট্রি বা কবিতা বা ছড়া, থাকতে পারে সায়েন্স নিয়ে তোমার লেখা রম্য রচনা, থাকতে পারে সায়েন্স নিয়ে যেকোনো সাহিত্যের রূপ! যদি সায়েন্সের পোকা হওয়ার পাশাপাশি মাথায় বইপোকা বা লেখার পোকা থাকে, তাহলে এই সেকশনে তুমি লেখা পাঠাতেই পারো।

কীভাবে লেখা পাঠাবে? আমাদের ম্যাগাজিনের ই-মেইলে গিয়ে জানাবে তোমার নাম, শ্রেণী এবং বিদ্যালয়। এরপর তুমি ডকুমেন্ট ফাইল আকারে আমাদেরকে তোমার লেখাটা প্রদান করবে, এবং ডকুমেন্ট ফাইল কী সেটা না বুঝলে গুগল ডক্স এর ফাইলের লিঙ্ক দিলেও হবে! এছাড়া যদি চাও, তাহলে লেখার সাথে যুক্ত করতে পারো বিভিন্ন ছবি! আর এরপর পরের ম্যাগাজিনে তোমার লেখার জন্য অপেক্ষা করো! এছাড়াও ইমেইলে তুমি কিন্তু তোমার লেখার উপর পেয়ে যাবে ফিডব্যাক এবং সেটার মাধ্যমে তোমার লেখাকে তুমি ইম্প্রুভ ও করতে পারবে!!

আমাদের মেইলঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com

প্রেয়সীর পৃথিবী

কাইল ইউনিভার্সিটির লাল ইটগুলো সকালের ঝলমলে রোদ্দুরে জ্বলজ্বল করছে। সাইকেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজে চারপাশ মুখোর, আসতে শুরু করেছে শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাস ভবনের সামনে একটা সাদা শার্ট, জিন্স এবং কাঁধে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেমন্ড। সে চারপাশ খেয়াল করছে, কিছু একটা খুঁজছে তার তীব্র চোখজোড়া। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠল হরাইজন্টাল ওয়েনিং ক্রিসেন্ট চাঁদের মতো একটা হাসি; নিখোঁজ অপেক্ষার অবসান ঘটেছে কিনা! সাইকেলে করে বন্ধুর সাথে রেস করে রেমন্ডের দিকেই এগিয়ে আসছে বছর তেইশের যুবতী, জেসিন্ডা। তার লালচে বাদামি চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, হাসতে হাসতে প্যাডেল চালিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণ। কিছুক্ষণ পরেই তাদের দুজনের সাইকেল এসে থামলো রেমন্ডের সামনেই। জেসিন্ডা তার বন্ধু রবার্টের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "ভালো চেষ্টা করেছিলে রবার্ট। কিন্তু শেষ অবধি আমিই জিতেছি!"

হঠাৎ তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো, ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠল হরাইজন্টাল ওয়েনিং ক্রিসেন্ট চাঁদের মতো একটা হাসি

জেসিন্ডা রেমন্ডের দিকে তাকিয়ে আরেকটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল, "যেমনটা আমি সবসময় জিতি।"
রেমন্ড সন্তর্পণে এগিয়ে জড়িয়ে ধরলো তার প্রেয়সীকে, "শুভ সকাল, গোলাপফুল।"

ভালোবাসা বড় বিচিত্র এক অনুভূতি, একটা আলাদা জগৎ। ভালোবাসা আসলে কি তা হয়তো কেউই জানে না। প্রিয়তমার মুখের হাসি ভালোবাসা, চোখের চাঞ্চল্য ভালোবাসা, মনের মিলন ভালোবাসা।

২.
পুরো শ্রেণীকক্ষ জুড়ে পিন পতন নীরবতা। থাকবে নাই বা কেন, লেকচারে আছেন গণিত ডিপার্টমেন্টের কড়া টিচার, প্রফেসর জ্যাকসন। যদিও তার ব্যবহারে রূঢ়তা কমই প্রকাশ পায়; কাঠিন্য মূলত চেহারায়, বলিষ্ঠ পদচালনা, যা কোনো এক জাদুকরী নিয়মে ভীত রাখে শিক্ষার্থীদের। সময়ের গতিতেই মুখ্য হয়ে তার পড়ানোর ধরণও।

প্রফেসর, "ভারতীয় গণিতবিদরা গণিতের জগতে বেশ অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন, বিশেষত টাইমলাইনের হিসেবে। যেমন ভাস্করের লীলাবতী থেকে আন্দাজ করা যায় ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় গণিতবিদেরা n! /(n-k)! k! অনুপাতে বাইনোমিয়াল কোইফিশিয়েন্টের নীতি প্রকাশ করতে জানতেন। "

রেমন্ড রুমের কোণার এক ডেস্কে বসে ঝিমুচ্ছে। গণিতের ইতিহাস তার তেমন একটা পছন্দের বিষয় না, কেন যেন সে তেমন আগ্রহ পায় না, যদিও সে ক্লাসের অন্যতম মেধাবী ছাত্র। প্রফেসর জ্যাকসনের তীক্ষ্ম চোখে রেমন্ডের ঝিমুনির দৃশ্য ধরা পড়ে যায়।

"এই ক্লাসে একজনের বোধহয় গতকাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তাই না মিস্টার রেমন্ড?"
রেমন্ড আচমকা হতচকিত হয়ে যায়। দ্রুত সে দাঁড়িয়ে লজ্জিত মুখে ক্ষমা চায়, "মাফ করবেন, প্রফেসর।"

জ্যাকসন তার মুখের রূঢ়তা বজায় রেখে দু'হাত পেছনে ভাঁজ করে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে যায় রেমন্ডের দিকে, এক সিঁড়ি, দু সিঁড়ি, আগাতে থাকেন তিনি। প্রফেসর রেমন্ডের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলেন, "মনোযোগ দিতে শেখো রেমন্ড। কে জানে, কখন কোন জিনিস কাজে লেগে যায়।"

৩.
বৃষ্টিভেজা এক সকাল। রবিবার, ছুটির দিন। ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়ছে রেমন্ড ও জেসিন্ডা। হুট করেই রেমন্ড বলে, "তোমার ছাতা রেখে আসো, দুজন এক ছাতার নীচেই থাকি আজ। "
জেসিন্ডা তার ছাতা রেখে দেয় গেটের এক কোণে। রেমন্ড জেসিন্ডার হাত ধরে এক ঝটকা টান দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলে, "চলুন ম্যাডাম।"

ভেজা পথ ধরে হাসতে হাসতে হেঁটে চলছে দুজন সঙ্গী, ভাগাভাগি হচ্ছে কথা, জড়িয়ে পড়ছে মন। পথের পর পথ শেষ হয়, ছাপিয়ে যায় বহু দালান। মেইন স্ট্রিটের পাশের ক্যাফেটেরিয়ার ভেতরে বসে পড়ে দু'জন। রেমন্ড ছাতা বন্ধ করতে করতে বলে, "ভীষণ শীত পড়ছে, আমার এক কাপ গরম কফি চাই।"

ভেজা পথ ধরে হাসতে হাসতে হেঁটে চলেছে দুজন সঙ্গী। পথের পর পথ শেষ হয়, ছাপিয়ে যায় বহু দালান

জেসিন্ডা সায় দেয়, "ঠিক আছে। আমি চা নিব।"

রেমন্ড ওয়েটারকে ডাক দিতেই এগিয়ে আসলো, সাথে করে পত্রিকাটাও এনে রাখলো টেবিলে, "শুভ সকাল।"
রেমন্ডও স্বাগত জানালো, "শুভ সকাল। দু'কাপ চা দেবেন।"

কিছুটা চমকিত হয় জেসিন্ডা, যদিও অপ্রত্যাশিত নয়। সে রেমন্ডকে চেনে। খানিকটা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, "তুমি না কফি নেবে?"

উত্তরে কেবল মুচকি হাসলো রেমন্ড। পত্রিকার দিকে নজর দিতেই একটা কিছু আকৃষ্ট করলো তাকে; শিরোনামে জ্বলজ্বল করছে-

"শহরে সিরিয়াল কিলার এসেসিনো।"

কিছুক্ষণ পরেই ওয়েটার চা নিয়ে আসলো। পত্রিকাটা ভাঁজ করে চায়ে হালকা চুমুক দিলো রেমন্ড। একটু উশখুশ করে বললো, "তোমার বাবা তো সেদিন আমার ওপর বেশ ক্ষেপে গেছিলেন বোধহয়।"
জেসিন্ডা একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে, "কি বলো, কখন?"

"আর বলো না। ভারতীয় গণিতবিদদের নিয়ে কিসব ইতিহাস বলছিলেন। আমার এমনিতেও এসব ইতিহাসে ঝোঁক কম, আমি ঝিমুচ্ছিলাম, তিনি দেখে ফেললেন। ব্যস, আমার কানের কাছে এসে কি বললেন কিছু বুঝলাম না।"

জেসিন্ডা হেসে বললো, "আমার বাবা এই দুনিয়ায় দুটো জিনিসকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। এক আমি, দুই এ গণিত। তাই সাবধান মিস্টার রেমন্ড, আমায় পেতে হলে আপনাকে গণিতকেও ভালোবাসতে হবে অনেক।"

"তোমায় ভালোবেসে কূল কিনারা পাচ্ছিনা আবার গণিতকে ভালবাসবো!"

জেসিন্ডা বেশ হেসে উঠলো, এমন হাসিতে ডুবে তার দিকে চেয়েই রইলো রেমন্ড। মেয়েটা বড্ড বেশি সুন্দর। চা শেষ করে দুজনে আবার ছাতা মেলে হাঁটা দিল। এক পা, দু পা। হেঁটেই চলেছে দুজন। এক রাস্তা হয়ে ঢুকে গেল অন্য কোনো রাস্তায়। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। জেসিন্ডা হঠাৎ থেমে গেল।

"তোমাকে ভালোবেসে কূল কিনারা পাচ্ছি না আবার গণিতকে ভালোবাসবো!"

"কি হলো জেসিন্ডা, থেমে গেল কেন?"
জেসিন্ডা প্রশ্ন করে, "আমায় ভালোবাসো তুমি রেমন্ড?"
রেমন্ড হঠাৎ এই প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না। কিছু মূহুর্ত অপেক্ষা করে সে জবাব দিল, "হ্যাঁ, বাসি।"
জেসিন্ডা মুখের কোণায় একটা দুষ্টু হাসি হেসে বলল, "তাহলে আমায় ধরো দেখি! "

এই বলে ছাতা ছেড়ে দৌড় দিল জেসিন্ডা। ছুটে গিয়ে আপন মনে হাত দু দিকে মেলে ঘুরতে ঘুরতে চিৎকার করে বলল,

"Vita est Speciosa. Life is beautiful."

রেমন্ড জেসিন্ডার এই পাগলামো দেখে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এক জীবনে এই মেয়ে আর কত তাকে অবাক করবে! ছাতাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে যখনই আগাতে গেল, তখন হঠাৎ কোথা থেকে যেন তেড়ে এলো একটা ভ্যান। দ্রুত গতিতে তেড়ে এসে জেসিন্ডাকে টেনে গাড়িতে তুলে চলে গেল ভ্যানটি। রেমন্ড বুঝতেও পারলো না কি হলো, আর যখন পারলো, ভ্যানটা তখন নাগালের বাহিরে চলে গেছে।

মানুষ কখন সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়? কখন তার নিজেকে সবচেয়ে বেশি অসহায় লাগে?

৪.
ভেজা শরীর নিয়ে রেমন্ড হেঁটে চলেছে, পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে জেসিন্ডাকে। একজন অফিসার তাকে বলেছে জেসিন্ডাকে হয়তো শহরে নতুন আবির্ভাব হওয়া এক কিডন্যাপার দল তুলে নিয়ে গেছে যে দলের প্রধান এক সিরিয়াল কিলার। নাম আসেসিনো, যে খেলতে খেলতে ভিক্টিমকে হত্যা করতে ভালোবাসে। জেসিন্ডাকে কেউ এভাবে তুলে নিয়ে যেতে পারে তার সামনে রেমন্ডের তা কল্পনাতেও ছিল না। সে নিজেকে দায়ী করতে থাকে,

"সব আমার জন্যে হয়েছে জেসিন্ডা। আমার তোমায় আগলে রাখা উচিৎ ছিল। আমি আসব জেসিন্ডা। আমি তোমায় বাঁচাব।"

মানুষ কখন সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়? কখন তার নিজেকে সবচেয়ে বেশি অসহায় লাগে? ভালোবাসার মানুষকে হারানোর ভয়ে কাতর হয়ে থাকা প্রেমিক যখন প্রেমিকার সুরক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে কাঠগড়ায় তোলে, পৃথিবীর সব অপরাধবোধ তখন তাকে ঘিরে ধরে।

রেমন্ডের ফোনে হঠাৎ রিং বেজে উঠে। পকেট থেকে ফোনটা বের করে পর্দায় উঠে থাকতে দেখে এক অচেনা নাম্বার। রিসিভ করে সে, "হ্যালো!"

ওপাশ থেকে ভেসে আসে ঠাণ্ডা স্বর, "তোমার বান্ধবীকে পেতে হলে ম্যালকম স্ট্রিটের ধারে পোস্টবক্স এর কাছে আসো। তার পাশের ভবনের দেয়ালে একটা বক্স পাবে, সেখানে পরবর্তী নির্দেশনা পাবে।

কল কেটে গেলো।

রেমন্ড এইপাশ থেকে অনবরত চেঁচাতে থাকে, "হ্যালো, হ্যালো কে বলছেন, জেসিন্ডা কোথায়? হ্যালো?"
রেমন্ড ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছে। মাথা কাজ করছিল না তার ভালোভাবে। নিজেকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

"ম্যালকম স্ট্রিট, আমায় ম্যালকম স্ট্রিটে যেতে হবে।"
রেমন্ড কোনো দিকে না তাকিয়ে ছুঁটে যেতে থাকে ম্যালকম স্ট্রিটের দিকে। জেসিন্ডাকে খুঁজে পেতেই হবে।

রবিবারের সন্ধ্যে, প্রায় গোটা দিনটা জুড়ে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় মানুষজনও কম। ম্যালকম স্ট্রিট বেশ ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আছে। কেমন যেন এক নীরবতা, আর সে নীরবতার বিভ্রাট ঘটায় রেমন্ড। বেশ হাঁপাচ্ছে সে, অনেকটাই দৌড়ে এসেছে। পোস্ট বক্সের পাশের অলিবার স্প্রাউট ভবনের লাল ইটের দেয়ালে স্পষ্ট একটা চারকোণা সিলভার রঙের বক্স দেখতে পেয়ে সেটির দিকে এগিয়ে গেল রেমন্ড। দেখলো ক্যালকুলেটরের মতো বেশ একটা কিপ্যাড বক্সের ওপর, কিপ্যাডের ওপর একটা স্ক্রিন এবং তার পরে একটা লেখা,

"শুধু যোগের মাধ্যমে ৮টি ৮ ব্যবহার করে ১০০০ সংখ্যাটি তৈরী করো।"

রেমন্ড বুঝতে পারলো এটা একটা ধাঁধা। এটা সমাধান করলে সে বক্সটি খুলতে পারবে। রেমন্ড ভাবতে থাকে,

"১০০০ এর আগে সবচেয়ে কাছের হলো ৮৮৮, তাহলে এর পরে ৮৮ যোগ করলে ৯৭৬, আর প্রয়োজন ২৪... "

রেমন্ড বেশ সহজে ভেবে ধাঁধাটির উত্তর বের করে ফেলে। সে কিপ্যাডে টাইপ করা শুরু করে, ৮৮৮+৮৮+৮+৮+৮, এন্টার বাটন চাপার পরই খুলে যায় বক্সের দরজা। ভেতরে সে একটা কাগজ পড়ে থাকতে দেখে। সে কাগজটা নিয়ে পড়া শুরু করে,

"বেকন স্ট্রিটের পোস্ট বক্সের পাশের ভবনের দেয়ালে আরেকটি বক্স পাবে।"

আকাশ গুমগুম করছে আবারও। বাতাসও বইছে বেশ থেকে থেকে, হয়তো আবারও বৃষ্টি নামবে। সারাদিনের বৃষ্টিতে ল্যাম্পপোস্টগুলো ভিজে গেছে, কোনোটা নিভছে, আবার জ্বলছে। কাছের বার থেকে গানের আওয়াজ শোনা যায়, কোনো এক

মিষ্টি গলায় গাইছে,

"You are my happiness
You are my despair
You are my hope
In all state of affairs
Having you is my dream
Anything else I don't care baby
Anything else I don't care."

রেমন্ড বেকন স্ট্রিটে এসে পৌঁছুলো। যথারীতি পোস্ট অফিসের পাশের ভবনে পেল আগের মতোই একটা লকড বক্স, কিপ্যাড এবং স্ক্রিনযুক্ত, এবং একটা নোট।

"কোনো একটা দেশে ধরো পাঁচের অর্ধেক হলো ৩। একই হিসাবে ঐ দেশে দশের এক তৃতীয়াংশ কত?"

রেমন্ডের কাছে এসব হেঁয়ালি মনে হচ্ছিল। কেউ খেলছে, কেন খেলছে সে জানে না। সে শুধু একটা কথাই জানে, জেসিন্ডাকে খুঁজে বের করতেই হবে। রেমন্ড মনে মনে হিসেব করা শুরু করলো,

" ৫ এর ১/২ = ৩, মানে ১/২ × ৫ = ৩,
১/৩ (১/২ × ৫) = ৩ × ১/৩,
বা, ১/৬ × ৫ = ১
বা, ২(১/৬ × ৫) = ২
বা, ২/৬ × ৫ = ২
বা, ১/৩ × ৫ = ২
বা, ২ × (১/৩ × ৫) = ৪
মানে ১/৩ × ১০ = ৪
উত্তর হবে ৪। "

রেমন্ড ৪ দিয়ে এন্টারে চাপ দিলে বক্সের ঢাকনা খুলে যায়। ভেতরে আরেকটা নোট। রেমন্ড নোটটা নিয়ে পড়লো,

"অলিভার মাউন্টের পাশের পরিত্যক্ত কারখানায় চলে এসো।"

ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। চারপাশে কেউ নেই।রেমন্ড তার পুরোপুরি ভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত হারপার লি'র আইস ফ্যাক্টরির সামনে।রেমন্ড ফ্যাক্টরির ভেতরে ঢোকা শুরু করে। কোনো এক দিন এই ফ্যাক্টরির মালিক ফ্যাক্টরিতেই গুলি খেয়ে খুন হয়। অনেক তদন্ত করেও সেই খুনিকে ডিটেক্ট করা যায়নি। পরে তার সন্তানেরা এই ফ্যাক্টরি বিক্রি করে দিয়ে চলে যায় শহর ছেড়ে।কোনো এক অজানা কারণে এই জায়গাটা আজও পরিত্যক্ত পড়ে আছে। রেমন্ড হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূরে একটা আলো দেখতে পায়। আরেকটু কাঁছে হেঁটে যায় , তারপর আরও একটু। কিছুক্ষণ বাদে সে আলোর নীচে একটা চেয়ার এবং তার পাশে একটা ছোট টেবিল

"খুব ভালো। খেলা শুরু হয়েছে। রেমন্ড, তিন নাম্বার দরজায় গুলি করো।"

দেখতে পায়। টেবিলের উপরে একটা পিস্তল।

এবং আরও কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে দরজা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কোথাও থেকে কেউ একজন বলে ওঠে, "হ্যালো, রেমন্ড! স্বাগতম ! ঐ চেয়ারে বসো।"

রেমন্ড চারপাশ তাকিয়েও কাউকে দেখতে পায় না। বুঝতে পারলো কোনো একটা ডিভাইসের মাধ্যমে কথাগুলো আসছে। রেমন্ড চিৎকার করে বলল,
"কে তুমি? জেসিন্ডা কোথায়?"

"চিৎকার কোরো না রেমন্ড। ভুলে যেও না তোমার বান্ধবী আমাদের কাছে। বসো।"

রেমন্ড চেয়ারটায় বসে পড়ল।

"আমাদের ব্যাপারে তুমি পুলিশের কাছে শুনেছো। আমি এই দলের প্রধান। আমার খেলতে খুব ভালো লাগে। বিশেষত গণিতের নানা ধাঁধা নিয়ে। এখন আমরা শেষ খেলাটা খেলব রেমন্ড। তুমি তোমার বান্ধবীকে পাবে যদি তুমি এই খেলায় সফল হও।"

রেমন্ড অধৈর্য্য হয়ে জানতে চায়, "কি ধরণের খেলা?"

"তোমার সামনে তিনটি দরজা। সবার বামে ১, মাঝে ২, ডানে ৩। তার যেকোনো একটার পেছনে আছে তোমার বান্ধবী। আর বাকি দুটো খালি। তোমার পাশের পিস্টলটায় আছে দুটি বুলেট। এখন, আমি যেভাবে বলব, সেভাবে করবে তুমি।"

"বেশ।"

"রেমন্ড, তোমার কি মনে হয়, কোন দরজার পেছনে রয়েছে তোমার বান্ধবী?"

রেমন্ড চিৎকার করে উঠলো, "আমি কি করে জানব? লুকিয়ে রেখেছো তো তুমি!"

"রেমন্ড, তোমার বান্ধবীর হাত পা মুখ বাঁধা। তার পেছনে রয়েছে আমার লোক, মাথায় গুলি তাক করে। তুমি আর একবার চিৎকার করবে, তোমার বান্ধবী এবং তোমার লাশ একসাথে পড়বে এই জায়গায়। এবার বলো, কি মনে হয়, কোনটার পেছনে আছে?"

রেমন্ড বেশ খানিকক্ষণ নীরব রইল। ভাবতে থাকল কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে। তারপর সে বলল, "এক নাম্বার, এক নাম্বার দরজার পেছনে জেসিন্ডা আছে।"

"খুব ভালো। খেলা শুরু হয়েছে। রেমন্ড, তিন নাম্বার দরজায় গুলি করো।"

রেমন্ডের বুক ধুপ করে উঠলো, "কি বললে? কেন?"

"তোমার ধারণা অনুযায়ী তো এক নাম্বারের পেছনে তোমার বান্ধবী আছে। তাহলে চিন্তা কি, করো গুলি। না হয় আমার লোকেরা গুলি করবে। "

রেমন্ড হাতে পিস্তলটা তুলে নিল। তিন নাম্বার দরজায় তাক করল, একটা দীর্ঘশ্বাস, আর তারপর, ঠুস শব্দে সজোরে তেড়ে গেল বুলেট। তিন নাম্বার দরজার একটা বেশ বড় সাইজের ফুটো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরই খুলে গেল দরজা, ওপাশে কিছু নেই, ফাঁকা। রেমন্ডের দমবন্ধ হয়ে ছিল, এবার কিছুটা নিঃশ্বাস ছাড়তে পারলো সে।

"ভাগ্যবান তুমি রেমন্ড। ভাগ্য পরীক্ষার শেষ অধ্যায়, ভাগ্য নির্ধারণের পালা এবার। এবার বলো রেমন্ড, কোন দরজার পেছনে তোমার বান্ধবী রয়েছে।"

কিছুক্ষণ আবার নীরব থেকে রেমন্ড জবাব দিল,

"২ নাম্বার। ২ নাম্বার দরজার পেছনে আছে জেসিন্ডা।"

"তুমি নিশ্চিত রেমন্ড? এর আগে তো তুমি বলেছিলে ১ নাম্বার দরজার পেছনে। "

"আমি নিশ্চিত।"

"ঠিক আছে। ১ নাম্বার দরজায় গুলি করো রেমন্ড। তুমি এখন হয় তোমার বান্ধবী রক্ষা করবে, আর না হয় সারাজীবন খুনি হয়ে থাকবে তোমার প্রেমিকার।"

রেমন্ড নীরবে তাকিয়ে আছে দরজা দুটোর দিকে। তার মন চাইছে না গুলি করতে, কিন্তু সে অপারগ এবং বাধ্য। মানুষকে যখন বাধ্য করা হয়, তখন সে বিদ্রোহী হয়ে উঠে, কিন্তু যখন সে বাধ্যবাধকতার সাথে অপারগতা এসে মিশে, তখন সে অসহায়।

"গুলি করো রেমন্ড। এখনই।"

রেমন্ড গুলি এক নাম্বার দরজায় তাক করল। আবারও প্রচন্ড শব্দ করে বুলেট বেরিয়ে ফুটো করে দিল এক নাম্বার দরজাকে। এবার এক নাম্বার দরজা খুলেনি, খুলে গেল দুই নাম্বার দরজা, ওপাশে হাত, পা, মুখ বাধা অবস্থায় বসে আছে সে আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, জেসিন্ডা। রেমন্ড দৌড়ে গিয়ে জেসিন্ডার হাত, পায়ের বাধন খুলে দিল, মুখের টেপ টেনে আলাদা করে দিয়ে জেসিন্ডাকে জড়িয়ে ধরল, চিৎকার করে বললো, "তুমি ঠিক আছো জেসিন্ডা?

ওরা তোমার কিছু করে নিতো, বলো তুমি ঠিক আছো?"

জেসিন্ডা মুখে একটা মৃদু হাসি টেনে বলল, "আমি ঠিক আছি রেমন্ড। আমার বোধহয় তোমার সাথেই ছাতার নিচে থেকে যাওয়া উচিৎ ছিল।"

প্রায় বারো ঘণ্টার একটা দুঃস্বপ্নের পর রেমন্ড এইবার হাসলো। জেসিন্ডা প্রশ্ন করলো, "তুমি কি করে বুঝলে আমি এই দরজার পেছনে?"

রেমন্ড জবাব দিতে পারল না, কারণ পেছন থেকে হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠ ভেসে আসলো।

"মন্টি হল প্রব্লেম-"

রেমন্ড এবং জেসিন্ডা সেদিকে তাকিয়ে থমকে গেল। দাঁড়িয়ে আছে প্রফেসর জ্যাকসন, জেসিন্ডার বাবা।

"১৯৯০ সালে হুইটেকার একটা চিঠিতে মারিলিন ভস সাভান্তকে প্রশ্ন করে যে ধরুন আপনি একটি গেম শোতে অংশ নিচ্ছেন, এবং আপনাকে তিনটি দরজা থেকে একটি পছন্দ করতে হবে: এর একটি দরজার পেছনে আছে একটি নতুন গাড়ি, বাকিগুলোর পেছনে ছাগল। ধরা যাক, আপনি পছন্দ করলেন ১ নং দরজা। এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালক, যে কিনা জানে কোন দরজার পেছনে কী আছে, খোলে আরেকটি দরজা, ধরা যাক ৩ নং দরজা, যার পেছনে আছে ছাগল।

সে তখন আপনাকে বলে, আপনি কি ২ নং দরজা বাছাই করতে চান? আপনি কি দরজা পরিবর্তন করলে কোন সুবিধা পাবেন? সাভান্ত বলে, সম্ভাবনা তত্ত্ব আনুসারে খেলোয়াড়ের পছন্দ পরিবর্তন করা উচিত—কারণ এর মাধ্যমে তার গাড়ি জয়ের সম্ভাবনা দ্বিগুণ হয়ে যায়, অর্থাৎ ১/৩ থেকে তা ২/৩। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এই ক্ষেত্রে ভুল করে কারণ তারা ভাবে যে সবগুলো দরজার সম্ভাবনাই সমান, এবং পছন্দ পরিবর্তন করলেও সম্ভাবনার পরিবর্তন হবে না। "

জেসিন্ডা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে "কিন্তু তুমি এখানে কি করছো বাবা? এসবের মানে কি?"

প্রফেসর উত্তর দেন, " তুমি তো জানোই এই পৃথিবীতে দুটো জিনিসের গুরুত্ব আমার কাছে সবচেয়ে বেশি, তুমি এবং গণিত। তাই আমি দেখছিলাম যে আমার মেয়েকে পছন্দ করে, গণিতকেও সে সেভাবে আঁকড়ে ধরতে পেরেছে কিনা।

তাই এই পুরো খেলাটা সাজানো। তুমি জিতেছো রেমন্ড। তুমি জিতে গেছো

এই জীবন তার সকল বিষাদ, বেদনা এবং যুদ্ধ নিয়ে শান্তির সাথে বসবাস করে। এককভাবে সুখ বা বেদনা নিয়ে জীবন সুন্দর নয়। সব বৈচিত্র্য, বৈপরিত্য, সৌন্দর্য এবং বৈরিতা নিয়েই জীবনে সুন্দর। Vita est Speciosa. Life is beautiful?",

আরাফাত জুয়েল
প্রথম বর্ষ, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বিজ্ঞানের রাজ্যে একদিন

অম্লদেশে ট্যুরে গিয়ে ভাঙলো যখন অস্থি,
অক্সিজেনে মুখ ডুবিয়ে পেলাম খানিক স্বস্তি।
টারবাইনের ঐ লম্বা মাথায় হাত বাড়িয়ে দেখি,
আকাশটা তো গ্যাসের খেলা, বাস্তবে সব মেকি।
নিউটনদার আপেলখানা, হাতে নিয়ে চক্ষুছানা,
দিতেই কামড় নিউট দাদা যেন আসলো দিতে হানা।
রেগে মেগে অসীম বেগে মারলো ছুঁড়ে লাথি,
এক আঘাতেই নিভে গেল ফসফরাসের বাতি।
এবার আমি গুটি গুটি, হাতে নিয়ে মটরশুটি,
মেন্ডেলা-ঘর রওনা দিলাম! ক্লোন বানিয়ে দুটি।
সালফারের ঐ গন্ধ শুঁকে হাঁটতে থাকি ধীরে,
একপা হাঁটি; দুইপা পিছোই, তাকাই পিছন ফিরে!
আর্কিয়াদের গোষ্ঠী দেখে দিলাম সেলাম ঠুকে,
হাজার হলেও পূর্বপুরুষ! যতই ভিন্ন দেখাক চোখে।
ক্লোনকে দিলাম বারো আনা; কিনতে দুখান কলা,
ক্যালসিয়ামের কেলাস দিয়ে ধরবো চেপে গলা।
কার গলা তা জানিনা নিজেও; ধরবো তবে দিব্যি,
মিথ্যা আমি বলছি না ভাই- এক চুলও, এক রত্তি।
একটু থেমে আবার তবে দিলাম ঝেড়ে হাঁটা,
এবার শুনো, থামবো না আর; যতই আসুক ঘটা।
হঠাৎ দেখি ফ্লেমিং বসে, মুখটি করে হাঁড়ি,
কুকুরটি তার দুদিন হলো, গে'ছে ভূলোক ছাড়ি।
হাতে সময় নেই মোটেও, তাই থামিনি আর,
ঠিক তখনই গান ধরলো বেবুন চমৎকার!
কি আর করি! গান শুনে মোর হৃদয় হলো ভোলা,
পাশেই দেখি জগদীশদা, খাচ্ছে গাছে দোলা।
আইনস্টাইন ঐ সাইকেল নিয়ে লাগাচ্ছে চক্কর,
গ্যালি-বুড়ো চোখ রাঙিয়ে বলছে, "ব্যাটা সর"।
পাশে বিশাল ত্রিভুজ এঁকে প্যাস্কু করে ধ্যান,
এরিস্টটল বটের ছায়ায় বাটছে দেখো- জ্ঞান।
আর্কিমিডিস আদুল গায়ে করছে ছুটোছুটি,
তাই না দেখে ম্যামথগুলো হেসেই লুটোপুটি।

"ধুত্তারিকা! এই ব্যাটা দেখ, সূর্য আসছে নুয়ে,
মেন্ডেলার ঘর যেতে হবে জলদি পা চালিয়ে। "
ধমক দিলো ক্লোন আমাকে তুই তোকারি করে,
বিস্ময়ে ও রাগে আমার মেজাজ গেল চড়ে।
"যাক গে বাবা! অত রেগে, কাজ কি আমার বলো",
এই বলে ফের রওনা দিলাম, ধরে নাসার সোলো।
আমিও হাঁটি, ক্লোনেও হাঁটে; হাঁটে মোদের ছায়াও,
বেনজিনের ঐ হাট কাটিয়ে হাঁটে শাতেল ভায়াও।
বিটুমিনের পিচ ঢালা পথ পাড় করে যেই গেলাম,
গ্রেগর বাবুর ভৃত্য এসে ঠুকলো আমায় সেলাম।
বললাম আমি, "আছেন কি ভাই মেন্ডেলা আজ বাড়ি?
দেখবো বলে এসেছি তাকে, নিযুত মুলুক ছাড়ি। "
ভৃত্য বলে, "মেন্ডেলা তো ঘরে এখন নাই,
একটু আগেই বাবু বেরোলেন কিনতে পুঁই ও রাঁই। "
শুনে বড় কষ্ট আমি পেলাম মনে মন,
সামলে ব্যাথা বলতে হলো, "মিলবো পরে ক্ষণ।
তুমি এখন রাখো বরং আমার তওফাখানি,
মটরশুটি এনেছি কিছু, খরচ করে মানি। "
মটরশুটি ধরিয়ে দিয়ে ভৃত্য রামুর হাতে,
মুখ ফিরিয়ে ফিরতে হলো বিন্ কোন সাক্ষাতে।
এক পা দুপা করে আবার দিলাম হাঁটা শুরু,
হিরের খনির ধারটি ধরে, টপকে পাঁচিল পুরু।
টাইটানেদের আস্তানাতে যাবো এখন ঠিক,
সেথা গিয়ে ভিনগ্রহীদের ফাইল করবো লিক।
ইন্টিগ্রেশন ট্র্যাপে ফেলে জুড়বো গ্যালাক্সিকে,
মুক্তি দিয়ে সাইন সি-টাকে, ধরবো কোসেক সি-কে।
বিজ্ঞানের এই কল্পজগত গিলবো রাহুর মত,
যাবো যেথা ইচ্ছে সেথা; ছুটবো অবিরত।

প্রাণাশীষ আচার্য,
দ্বাদশ শ্রেণী
বাকলিয়া সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম।

আপনি কি জানেন?

পর্যাপ্ত ঘুম না হলে হার্টের সমস্যার পাশাপাশি ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে!

ঘুম না হলে শরীরের "লিভিং অরগানিজমগুলো" ঠিকমতো কাজ করতে না পেরে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এবং এর কারণে বাড়তে পারে উচ্চ রক্তচাপ ও হাইপার টেনশন। অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে প্রতিনিয়ত কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা থেকে হার্টের সমস্যা বাড়তে থাকে। এছাড়া শরীরে ইনসুলিন উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত সঠিক মাত্রায় ঘুম না হলে একজন মানুষ ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন যার কারণে একটি সুন্দর জীবনও বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে।

আমাদের দৈহিক প্রায় সব কার্যকলাপই ঘুমের উপরে অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই কোনও রকম অবহেলা না করে নিয়মিত প্রতিদিন অন্তত ৬-৭ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি।

WHITE BOARD SCIENCE CLUB

মূল আকর্ষণ

বর্তমান সময়ে একদিকে যেমন করে বাড়ছে শিল্পায়ন ও নগরায়নের উত্তরোত্তর ব্যাপকতা, একই প্রেক্ষিতে তাল মিলিয়ে সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানান মানসিক সংকট। কবিগুরুর ভাষ্যমতে "ইটের ওপর ইট, তারই মধ্যে কীট"; সেখানে মনের খোঁজখবর রাখবার ফুসরত-ই বা কই?

মনোবিজ্ঞানীদের অনুকল্প বা হাইপোথিসিস মতে, অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মহামারী হয়ে দেখা দিবে বিভিন্ন প্রকারের মানসিক সমস্যা। ডিপ্রেশন, ওসিডি, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, কিংবা সিজোফ্রেনিয়া আমাদের কাছে নৈমিত্তিক পরিস্থিতিতে পরিণত হওয়ার আগে তাই খুব জরুরি মনপাখির নানান দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। এই লক্ষ্যেই আমাদের এবারের আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য সাইকোলজির অ আ ক খ নিয়ে পর্যালোচনা করা, সকলের কাছে সম্যক ধারণা নিয়ে উপস্থাপন করা- "সাইকোলজির আদ্যোপান্ত"।

কেমন বোকা মনটা রে!

"Human brain is the most complex thing in the universe that maybe it's not even enough to understand itself."

আসুন একটু ভাবি।

আমরা খুশির সংবাদে বা প্রিয় জিনিস পেলে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হই আবার কোনো বাজে কিছু ঘটলে কষ্ট পাই, ভেঙ্গে পড়ি, তাই না? কেন হয় এমন? কেনই বা আমরা হাসিখুশির মাঝেই হঠাৎ রেগে যাই? রাগ কেন হয়? কেউ প্রশংসা করলে কেনই বা ভালো লাগে? ভুলে যাই, আবার হুট করে মনে পড়ে, আরেহ এইতো বলে স্মৃতি হাতড়াতে থাকি। কেন ভুলি আবার কেনই মনে পড়ে?

আরেকটু ভাবি। আরো জটিল প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করি।
মন কেন এত কথা বলে- গানের সুর থেকে একটু সরে এসে ভাবি তো, এতগুলো গান কিংবা কবিতার মূলপ্রাণ এই মন বলতে আসলেই আমরা কী বুঝাই? মন কী? প্রশ্নটি সবারই এসেছিল সেই ছোটবেলায়। চারপাশের মানুষ সাধারণ ভাষায় বুঝিয়ে দিলে যা উত্তর পাওয়া যেত এমন যে, যা দিয়ে আমরা ভাবি, চিন্তা করি সেটিই মন। তা মন মশাই, আপনি থাকেন কোথায়? "বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে, হৃদয়ে দিয়েছ দোলা~" এই পঙ্কতির মতো কি তবে আমরা অনুভব করার হাতিয়ার, ইন্দ্রিয় দিয়ে যা বুঝার চেষ্টা করি, অনুভূতির জন্ম হয়, হৃদয়েই কি তার উৎপত্তি? হৃদয়ই কি তবে মনের কর্মস্থল? অল্প বিজ্ঞান জানা মানুষটিও এখন জানে তা সত্যি নয়, কিন্তু গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল সেই ভুল ধারণাই পোষণ করতেন!
প্রশ্ন হলো, তাহলে আমরা বিজ্ঞান দিয়ে কী করে ব্যাখ্যা করবো প্রতি মুহূর্তের চলমান ভাবনা, আমাদের ব্যবহার কিংবা প্রতিক্রিয়া, অনুভূতিগুলো? সময়ের সাথে প্রতিটি মানুষের যে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তিত্ব কী আসলে? এই যে আমরা পড়ছি লেখাখানা, পড়তে পড়তে বুঝার চেষ্টা করছি, ভাবছি, কিন্তু কীভাবে? প্রশ্নগুলো ভাবা যতটা সহজ, আদিযুগ থেকে আজ অবধি সেই উত্তর খোঁজার পথ ততটাই কঠিন ছিল, যেখানে যার গাঠনিক কোনো অস্তিত্ব নেই, তবে ঠিকই প্রতিনিয়ত প্রভাব খাটিয়ে যাচ্ছে, শুরুতে এমন ধারণা বিশ্বাস করাই ছিল অনেক বেশি বিস্ময়কর। কিন্তু মানুষের কৌতূহল বড্ড জেদি, অন্বেষণ থেমে থাকেনি। উত্তরের খোঁজ দিতে গোড়াপত্তন ঘটে সাইক্যোলজির (PSYCHOLOGY), বাংলায় যাকে আমরা "মনোবিজ্ঞান" বলি বটে। তবে সাইক্যোলজি কেবল মন নিয়েই কাজ করে না, তাই বিভ্রাট এড়াতে আমরা পুরো লেখাজুড়ে "সাইক্যোলজি" শব্দটিই ব্যবহার করবো। তাহলে এই সাইক্যোলজি কি উপরের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? দেখা যাক, আমরা পড়তে পড়তেই নাহয় অনুধাবন করি।

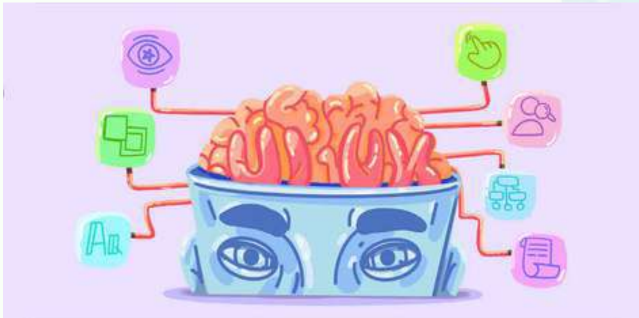

"PSYCHOLOGY IS THE SCIENTIFIC STUDY OF MENTAL PROCESSES & BEHAVIOR."

Psychology শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দধাতু থেকে, psyche এবং logia.

সাইক্যোলজি কী?

সময়ের সাথে গবেষণার বিবর্তনে বর্তমানে যে সাধারণ সংজ্ঞা দাঁড়ায়, তা হলো এইযে আমরা সেন্সোরি সিস্টেম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করি, শিখি, চিন্তা করি, স্মৃতি মনে রাখা কিংবা ভুলে যাওয়া, আমাদের আচরণ, প্রতিক্রিয়া, আবেগ অনুভূতি, সময়-পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া- সাইক্যোলজি এইসকল কিছুকে বিজ্ঞান দিয়ে বুঝার চেষ্টা করে, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।
PSYCHOLOGY শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দধাতু থেকে, PSYCHE এবং LOGIA. PSYCHE শব্দটি আত্মাকে (SPIRIT OR SOUL) এবং LOGIA দিয়ে গবেষণাকে ইঙ্গিত করা হতো। সহজ কথায়, তখনো সাইক্যোলজি ছিল আত্মার গবেষণালব্ধ এমন কিছু। বহুবছর সাইক্যোলজি সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ফিলোসফি বা দর্শনশাস্ত্রের মূল ধরে নেওয়া হয়। বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে সাইক্যোলজির যাত্রা শুরু হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে, জার্মানিতে।

বিজ্ঞানী WILHELM WUNDT ভাবলেন, যদি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কাঠামো দাঁড় করানো যায়, তবে মানুষের আচরণকে কেন নয়? সেই পরীক্ষা করতে ১৮৭৯ সালে তিনি প্রথম সাইক্যোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তিনি এবং তার সহযোগীরা মূলত কোনো নির্দিষ্ট কিছু ঘটনায় যেমন: সূর্যাস্ত দেখার অনুভূতি, কফির স্বাদ- প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে একটা কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে চান, যা তাঁর শিষ্য EDWARD B. TITCHENER এর হাত ধরে যাত্রা শুরু করে STRUCTURALISM নামে। তবে স্ট্র্যাকচারালিজম এতোটাই ছোট পরিসরের সাধারণ ঘটনাতে প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছিল যে, তেমন অগ্রগতি ঘটেনি এই পরীক্ষণে।
বরং প্রতিক্রিয়া কিংবা আচরণগুলো কীভাবে কাজ করে, মানুষকে তার পরিবেশে বেঁচে থাকতে কীভাবে সহায়তা করে, তা গবেষণা করতে আমেরিকান বিজ্ঞানী WILLIAM JAMES প্রতিষ্ঠিত করেন FUNCTIONALISM. ফাংশনালিজম সময়ের সাথে সাথে বিভিক্ত হয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি উপশাখায়, বিভিন্ন স্কুল অফ থটসে। সাইক্যোলজিকে ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বিশেষ তত্ত্ব সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, এদের প্রত্যেকটিকে স্কুল অফ থটস বলা হয়। সাইক্যোলজির যাত্রাপথে প্রধান দুইটি স্কুল অফ থটস (SCHOOL OF THOUGHTS) কিন্তু STRUCTURALISM এবং FUNCTIONALISM.

পরবর্তীতে অস্ট্রিয়ান ফিজিসিয়ান SIGMUND FREUD সাইক্যোলজিতে বড়সড় পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তিনি HYSTERIA এবং তার অন্যান্য রোগীদের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে লিখেন "THE PSYCHOPATHOLOGY OF EVERYDAY LIFE", যেখানে তিনি বর্ণনা করেন, শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা এবং চারপাশের ঘটনায় যেই উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, এগুলো কী করে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে ও আচরণে প্রভাব খাটাতে পারে। তিনি ব্যাখ্যা করেন অবচেতন মনে ভাবনা-চিন্তা, উদ্দীপনাগুলো কীভাবে প্রকাশিত হয়। আমরা কতটা যুক্তি দিয়ে করি, কতটা প্রভাব থাকে আমাদের অবচেতন মনের- ব্যাখ্যাগুলো দাঁড় করাতে FREUD এর PSYCHOANALYSIS প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুক্তি-চেতনা-অবচেতন মনে চিন্তাভাবনা একপাশে সরিয়ে BEHAVIORISM আসে বিশ শতকের চিত্রপটে, প্রায় পঞ্চাশ বছরের আধিপত্য ছিল এই স্কুল অফ থটের, যেখানে সাইক্যোলজিকে ব্যাখ্যা করতে পুরোপুরিভাবে মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। পরবর্তীকালে আরো বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্কুল অফ থটস- এর আবির্ভাব হয়।

WUNDT এর ল্যাব থেকে সময়ের সাথে আরো ব্যাপ্তি বাড়ে মর্ডান সাইক্যোলজির, আরো সূক্ষ্ম হয় সাইক্যোলজি নিয়ে পরীক্ষণ-গবেষণা-তত্ত্ব এবং স্কুল অফ থটস, দুই শতক ধরে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানমহলে স্থান করে নেয় স্বকীয়তায়।

সেইসাথে সাইক্যোলজির ব্যাপ্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে দৈনন্দিন জীবনের সবখানেই।

- কগনিটিভ সাইক্যোলজি আমাদের শেখা-চিন্তা-স্মৃতি-ভাষা-সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে আলোচনা করে; অপরদিকে, মানুষের আচরণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কেমন হতে পারে, সেটি ব্যাখ্যা করে বিহেভিয়ারেল সাইক্যোলজি।

- শিশু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেড়ে উঠা, বয়সের সাথে মানসিক পরিবর্তন, ম্যাচুরিটি নিয়ে গবেষণায় রয়েছে ডেভেলপমেন্ট সাইক্যোলজি; প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব তাদের ব্যতিক্রম করে তুলে, এই ব্যক্তিত্বের বিজ্ঞান ব্যাখ্যায় আছে পারসোনালিটি সাইক্যোলজি, আবার তেমনি সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের মানুষ, সামাজিক বিষয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ ব্যাখ্যা করে সোশ্যাল সাইক্যোলজি। সমাজের বিপরীতে অপরাধ জগত, সেখানে ফরেনসিক সাইক্যোলজি ক্রিমিনালদের সাইক্যোলজি নিয়ে গবেষণা করে, অপরাধীর শাস্তির মাত্রা নিয়ে আইন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- কাউন্সিলিং সাইক্যোলজি প্রধানত কাজ করে ব্যক্তিগত মানসিক সুস্বাস্থ্য নিয়ে; অন্যদিকে এবনরমাল সাইক্যোলজি দুশ্চিন্তা, ডিপ্রেশন কিংবা ক্লিনিক্যাল সাইক্যোলজি মানসিক রোগ, ফোবিয়া, সিন্ড্রোম, সাইক্যোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার নিয়ে ব্যাপক পরিসরে কাজ করে- গবেষণা থেকে শুশ্রূষা পর্যন্ত।

- সাইক্যোলজি নিয়ে তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ এক্সপেরিমেন্টাল সাইক্যোলজি করে; তেমনি কীভাবে বিভিন্ন স্থান এবং সংস্কৃতি মানুষের আচরণে ভূমিকা রাখে তা তুলে ধরে ক্রস-কালচার সাইক্যোলজি। আমাদের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের সাথে আমাদের ব্যবহার, সাইক্যোলজির সম্পর্ক ব্যাখ্যার কাজ বায়োসাইক্যোলজির, আবার কম্পারেটিভ সাইক্যোলজির কার্যক্ষেত্র প্রাণীদের আচরণ-প্রতিক্রিয়া নিয়ে, যেটি মানুষের সাইক্যোলজি বুঝতে সাহায্য করে।

- ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি কর্মক্ষেত্র, বাজারব্যবস্থা এবং ক্রেতাদের সাইকোলজি নিয়ে গবেষণা করে, আবার এডুকেশনাল সাইকোলজি শিক্ষণীয় বস্তু এবং শিক্ষা প্রদান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসমাজের সাইকোলজি নিয়ে কাজ করে।

দিনশেষে, ম্যাচ জিতে মুশফিকের নাগিন উদযাপন থেকে শার্লক হোমসের ক্রিমিনাল বিহেভিয়ার ইনভেস্টিগেশন, মন খারাপ থেকে মার্কেটিং, মোদ্দাকথা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাইকোলজির যেমন অবাধ বিস্তার তেমনিই তাতে সাইকোলজির ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে সাইকোলজি নিয়ে কিছুক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশই বড্ড ভুল ধারণা পোষণ করি। যেমন,

"মানসিক রোগটোগ কিসসু না, ঠিক হয়ে যাবে/ আরেহ বাবার ঝাড়ফুঁকই যথেষ্ট"

দুঃখজনক হলেও এখনো যেমনটা বিজ্ঞানশিক্ষা সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছাতে পারেনি, বিশেষ করে এই দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলগুলোতে ঠিক ততটাই কুসংস্কার আজো পালন করা হয় বহুলাংশে। সেটি আরো বেশি সত্যি হয় যখন প্রেক্ষাপটে সাইকোলজি হাজির হয়। অনেক মানুষই বিভিন্ন ফোবিয়া, সিন্ড্রোম কিংবা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত। তাদের চিকিৎসার প্রয়োজনবোধটুকু অনেকসময় শিক্ষিত মানুষরাই পাত্তা দেন না, হেসে উড়িয়ে দেন কিংবা এড়িয়ে যান। অন্ধকার অঞ্চলে সেগুলো আরো বেশি ভয়ংকর। যেখানে অভিজ্ঞ সাইকোলজিস্ট কিংবা সাইক্রিয়াটিক ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন, সেখানে ঝাড়ফুঁক, ঠাণ্ডাজলে ডুবিয়ে রাখা, পেটানো, বিভিন্ন মিশ্রণজাত তরল সেবন করানো- এইসবের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার বদলে আক্রান্তকে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করা হয়। ফলস্বরূপ অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটে, অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। তাই সচেতন যেমন হওয়া উচিৎ, তেমনি সচেতনতা সৃষ্টিও মুখ্য বিষয়।

"সাইকোলজি আর সাইক্রিয়াট্রি কি একই? পাগলের ডাক্তার!?"

সাইকোলজি কিংবা সাইক্রিয়াট্রি নিয়ে ক্যারিয়ার করতে চাইলে প্রথম কথা শুনতে হয়, "পড়ে কি করবি? পাগলের ডাক্তারি!?" যাদের এইক্ষেত্রগুলো নিয়ে আগ্রহ থাকে, তাদের কাছে পরিবার সমাজ থেকে এই কথাগুলো শোনা নতুন কিছু নয়। কিংবা অনেক পাঠক স্বীকার না করলেও এমন পাওয়া যাবে, কথাগুলো নিজেই কখনো বলেছেন বা বিশ্বাস করতেন। এই ধারণা থেকে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বেরিয়ে আসতে হবে।

সাইকোলজিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা Willhelm Wundt, Edward B. Titchener ও William James

সাইকোলজি প্রকাণ্ড একটি বিষয়, যা সহজ অর্থে, মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-উদ্দীপনা-প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তিত্ব- সকলকিছুকে বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে এবং ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। সাইকোলজির একটি শাখা হলো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি, যা মূলত মানসিক রোগ, অস্বাভাবিক আচরণ, সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার কিংবা সাইক্রিয়াটিক ডিসঅর্ডার নিয়ে আলোচনা করে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির একটি অংশ হলো সাইক্রিয়াট্রি, যেটির লক্ষ্য এই সংক্রান্ত রোগীদের নিরীক্ষণ করে রোগসমূহ শনাক্ত করে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করা। আবার সাইকোলজিস্ট হতে হলে এই বিষয়ে গ্রাজুয়েশন করতে হয়, যেখানে সাইক্রিয়েস্টিট হতে গেলে মেডিকেলে পড়ে সাইক্রিয়াট্রিতে স্পেশালিষ্ট হতে হয়।

সাধারণত পাগলামোকে চিকিৎসার ভাষায় EXTREME CONDITION OF MANIC বা MANIC EPISODE বলা হয়, আবার আমরা অনেকসময় সাধারণ দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন রোগকে ভুল বুঝে পাগলামো বলেই ইঙ্গিত করি।

ম্যানিক অসংখ্য সাইক্রিয়াটিক ডিসঅর্ডারের একটি। তাই আজ থেকে জেনে নিন, সাইকোলজি এবং সাইকিয়াট্রি এক নয়, এবং এই দুটো নিয়ে ক্যারিয়ার করতে হলে কেবল ম্যানিক ডিসঅর্ডার অর্থাৎ পাগলামো সারাতে হয় না। পাঠকের ডিপ্রেশনের জন্য একদিন সাইকোলজিস্টের কাছে শরণাপন্ন হলেও হতে পারেন। আরেকটি কথা, পাগলামো সারানো, সুস্থ করার চেষ্টা বরং প্রশংসনীয়, তিরস্কারের বিষয় নয়!

"সাইকোলজি বিজ্ঞানের অংশ নাকি!?"

হাইপোথিসিস (অনুকল্প), বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে নিরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, অনুসিদ্ধান্ত, সফলতা এবং সীমাবদ্ধতা- বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয় ধাপগুলো অনুসরণ করে। সাইকোলজি বিজ্ঞানের তুলনামূলক নতুন শাখা বং সিউডোসাইন্সের অংশ হলেও প্রক্রিয়াটির ব্যতিক্রম নয়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর আচরণ ব্যাখ্যার জন্যে সাইকোলজি উপরোক্ত ধাপগুলোর উপর নির্ভর করে।

এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিস্টরা বিভিন্ন তত্ত্ব, স্কুল অফ থটস নিয়ে হাইপোথিসিস পরীক্ষণ করে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুসিদ্ধান্ত আসেন এবং সেটি বিজ্ঞানীমহলে প্রস্তাবনা হিসেবে পেশ করেন। তবে এটিও সত্যি যে, মানুষের মনোভাব, আচরণে বিভিন্নতা এবং পরিবর্তনের প্রবণতা এতোটাই প্রবল যে, কোনো তত্ত্ব কিংবা প্রস্তাবনা নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পরিস্থিতির জন্য সত্য হলেও ভিন্ন স্থান-সংস্কৃতি-সময়ের জন্য ভিন্ন হতেই পারে।

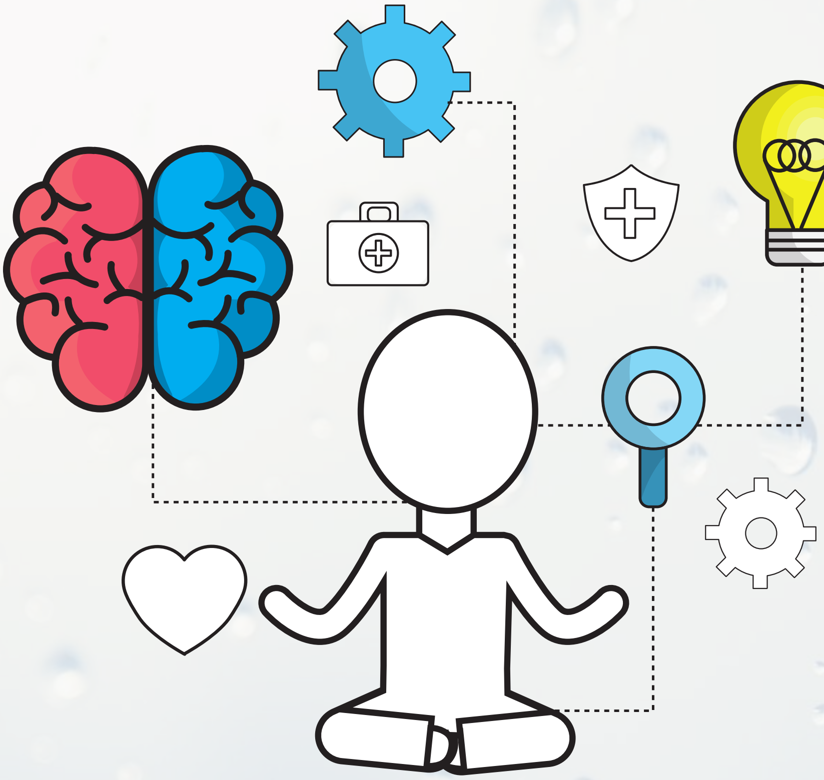

এখন প্রশ্ন হলো সাইক্যোলজি নিয়ে আমাদের জানাটা কেন প্রয়োজন?

একটু চিন্তা করে দেখি তো, আপনি কিংবা আপনার পাশের মানুষটা, কেউ কি ভালো আছি আমরা? প্রতিদিন আমাদের কিছু না কিছু ঘটছেই। কখনো আমরা রাগ করছি, চড়াও হচ্ছি কাছের মানুষের উপর, পরেই আবার অনুতপ্ত হচ্ছি, কেন করেছি এমন জানি না। অন্যের কাছে যেটি স্বাভাবিক, সেটি আমার কাছে ভয়ের বিষয় কেন? খুবই সাধারণ মন খারাপ কিংবা টেনশন থেকে আত্মহত্যার প্রবণতা, কেন? মানুষ দিনকেদিন এত হিংস্র হচ্ছে কেন? ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে ভয়ানকভাবে, কিশোররা বাজেভাবে জড়িয়ে পড়ছে রক্তারক্তিতে, কেন? আমাদের চারপাশের মানুষের এতটা পরিবর্তন, নিজের দিকে তাকালে দেখবেন, আপনিও পালটে গেছেন, যাচ্ছেন, হয়তো ভালো নেই আপনি, কিন্তু কেন এমনটা হচ্ছে বলতে পারেন?

জানি, হয়তো আশানুরূপ উত্তর পাননি। আপনাকে জানতে হবে তারা কীভাবে ভাবছে, তাদের জীবনে কোন কোন ঘটনা কেমন প্রভাব রাখছে, হয়তোবা তখন পারবেন কিছুটা বুঝতে। এখন প্রশ্ন, আমি তো অন্তত জানি আমার কথা, কিন্তু আমার সমাধান কেন পাচ্ছি না তবে? সে জন্য জানতে হবে আমাদের এই মন কী করে কাজ করে, বুঝতে হবে এর আড়ালের বিজ্ঞানটুকু, বুঝতে হবে কিন্তু সাইক্যোলজি। তাই সাইক্যোলজি কীভাবে কাজ করে- এই নিয়ে জ্ঞান আহরণ প্রতিটি মানুষের দরকার, নিজের স্বার্থ বিবেচনা করেই। তবে কি আমি নিজেই সাইক্যোলজি নিয়ে ঘাটাঘাটি করে নিজের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো? সবসময় নয়। এরজন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞজন, সাইক্যোলজিস্টরা, পক্ষান্তরে প্রয়োজনে সাইক্রিয়েট্রিস্ট। জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভারে তারা পারবেন আপনাকে সমস্যা সমাধানের পথের সন্ধান দিতে।
আর যাদের আগ্রহ আছে, হয়তোবা ক্যারিয়ার হিসেবেই সাইক্যোলজি গ্রহণে মনস্থির করেছেন, তারা তো জানতে চাইবেন নিশ্চয়ই।

আরো জানতে চাই সাইক্যোলজি নিয়ে...

সাইক্যোলজি নিয়ে কারোর আগ্রহ থাকলে, শুরু করতে পারি ইউটিউবের Crash Course চ্যানেলের সাইক্যোলজির কোর্সটি দিয়ে। বেশ সহজ ভাষায় সংক্ষেপে তুলে ধরেছে সাইক্যোলজির মূল বিষয়গুলো। সাইক্যোলজির যেকোনো কিছু নিয়ে বিস্তারিত জানতে সোর্স হিসেবে আছে www.verywellmind.com, সাইটটি বেশ হেল্পফুল, প্রতিটি টপিককে বেশ গুছিয়ে বুঝানো হয়েছে, সাথে রিডাইরেক্ট সাহায্য করবে নতুন কোনো টার্মকে বুঝে নিতে। একটু এডভান্সড লার্নিংয়ের জন্য আছে MIT OpenCourseWare নামের ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে প্রায় সকল গ্রাজুয়েশন সাবজেক্টের উপর এমআইটি ইউনিভার্সিটির লেকচার পাওয়া যায়। এছাড়াও সাইক্যোলজি এবং এই সংক্রান্ত ফিলোসফির উপর ননফিকশনাল বেশ ভালো কিছু বই আছে, গুগল বুক সাজেশনই পেয়ে যাবেন।

সাইক্যোলজির সাথে পথযাত্রা শুরু হোক।
আপাতত এই বোকা মনকে সামলাই, বিদায়!

লেখনীতে:
আরিফ আবরার নাঈম
চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

তথ্যসূত্র:
www.verywellmind.com
Psychology: A Very Short Introduction
-Book by Freda McManus and Gillian Butler
MIT opencourseware- lectures on psychology

কেউ কোথাও ভালো নেই যেন সেই

কথায় বলে, সুস্থতা সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে বড় নিয়ামত। সুস্থতা যে কত বড় দান তা আমরা বুঝতে পারি নিজেরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি সেই সময়টায়। শারীরিক অসুস্থতায় যেমন মানসিক অশান্তি ঘটে, মানসিক অশান্তির জন্যে তেমন শারীরিক অসুস্থতা ঘটে থাকে। মাঝে মাঝে আমাদের সকলেরই মনে হয় এই জীবনটাই বৃথা। এই জীবন থেকে কোনো কিছুই চাওয়া পাওয়ার নেই। মনের মধ্যে সবসময় বাজতে থাকে, কেন এই বেঁচে থাকা? আপনারও কি এমন কিছু মনে হয়? এখন যদি ধরেন আপনি কোনো মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত যার ফলস্বরূপ আপনি একা একা বিড়বিড় করে কথা বলেন, অকারণে নিজে নিজে হাসেন, বিষন্নভাবে থাকেন, আত্মহত্যার চিন্তা করেন তাহলে সকলে বিশ্বাস করবে এর পিছনে বিভিন্ন নৈসর্গিক শক্তি যেমন জ্বিন-পরী, ভূত-প্রেতের খারাপ নজর পড়া বা আছর হওয়া দায়ী যা কি-না সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন।

মানসিক ব্যাধি জ্বর, সর্দি, যক্ষা, টাইফয়েড বা ক্যান্সারের মতোই একটি রোগ। কিন্তু "মানসিক ব্যাধি" কথাটি শুনলে কেউ ঘৃণায় মুখ বাঁকায়, কেউ অবজ্ঞায় নাক সিটকায়, আবার কেউবা বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হলো মানে সে যেন বিশাল কোনো অপরাধ করে ফেললো যার কলঙ্ক তাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়। এখানে মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষদের 'পাগল' মনে করা হয়। কিন্তু কেন? কী দোষ তাদের? তাদের দোষ একটাই। তারা মানসিকভাবে অসুস্থ!!

WHO এর সমীক্ষা অনুসারে, বর্তমানে সারা বিশ্বের প্রতি চারজনের একজন তার জীবনের কোনো না কোনো সময়ে যেকোনো মানসিক ব্যাধির শিকার হয়ে থাকেন এবং বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ শিশু-কিশোরেরা বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে।

এগুলো তো গেলো হিসাবের কথা, মানসিক রোগের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এবং একই সাথে ভয়ানক দিকটি হচ্ছে এর বিচিত্রতা। এমন কিছু অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি রয়েছে, যার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আর আজকের আমাদের এই আয়োজন তেমনি কিছু অদ্ভুতুড়ে মানসিক ব্যাধি নিয়ে। আসুন তাহলে এই ব্যাধিগুলো সম্পর্কে একে একে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

• সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)

সিজোফ্রেনিয়া একটি গুরুতর মানসিক ব্যধি। মানসিক রোগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর এবং সবচেয়ে অক্ষম করে তোলা রোগের মধ্যে এটি অন্যতম। সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। বাস্তববিমুখী কথা বলে বা আচরণ করে। এমন সময় রোগী কল্পনা এবং বাস্তবজগতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা। অকারণে ভয় পাই এবং সন্দেহ করে। এমন কি এরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষকেও সন্দেহ করে। এদের মনে হয় কেউ তাকে মেরে ফেলবে,আঘাত করবে। ফলে কারো সাথে মিশতে বা কথা বলতে চায় না। কোথাও যেতে যায় না।
সিজোফ্রেনিয়া রোগের অন্যতম আরেকটি অক্ষমতা হলো হ্যালুসিনেশন। এরা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাই বা অদ্ভুত কথা শুনতে পাই যা অন্যরা দেখতে বা শুনতে পায়না।
এদের হঠাৎ আচরণের পরিবর্তন হতেও দেখা যায়।যেমন-কোনো কারণ ছাড়াই কান্না করে কিংবা আত্মহত্যা করে। হঠাৎ করেই জনসম্মুখে কাপড়-চোপড় খুলে ফেলা কিংবা গভীর রাতে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো অদ্ভুত আচরণও এরা করে থাকে।
সিজোফ্রেনিয়া রোগীর এমন সব আচরণের কারণে অনেক সময় এদের উন্মাদ বলা হয়ে থাকে। ফলে এরা সম্মানহীন, বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন জীপনযাপন করতে থাকে।শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সিজোফ্রেনিয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে, মস্তিষ্কের নিউরোকেমিক্যাল ত্রুটি কিংবা ভারসাম্যহীনতার কারণে এ রোগ হয়। এছাড়া জন্মগত জটিলতা, বংশগত কারণ, মানসিক চাপ ইত্যাদির কারণেও এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
আক্রান্ত ব্যক্তির আচরণ ও কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা হয়।

• অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (Obsessive compulsive disorder)

অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (Obsessive compulsive disorder) বা ওসিডি। বাংলায় বলা হয় শুচিবাই, এটি একটি মানসিক উদ্বেগজনিত রোগ। ওসিডির ক্ষেত্রে একটি অবসেসিভ থট বা চিন্তা বারবার রোগীর মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। রোগী বুঝতে পারে এটা অযৌক্তিক, দমনের চেষ্টা করে , ব্যর্থ হয়। ফলে অস্বস্তি বোধ হয়।

ওসিডি বা শুচিবাইের দুইটি অংশ রয়েছে- অবসেশন এবং কম্পালশন।
অবসেশন হলো একই চিন্তা, কোনো ছবি বা ইচ্ছা মনের মধ্যে বারবার ঘুরপাক খাওয়া। যেমন-দরজায় তালা লাগিয়ে বাসা থেকে অফিসে পৌঁছানোর পরে হঠাৎ আপনার খেয়াল হলো বাসার দরজায় ঠিকমতো তালা লাগিয়েছেন কিনা তা মনে করতে পারছেন না। চিন্তাটা বারবার আসতে থাকে ফলে অস্থিরতা তৈরি হয়।
অন্যদিকে কম্পালশন হলো এই অবসেসিভ চিন্তা বা ইচ্ছাগুলো দমনের প্রচেষ্টা। যেমন-উপরের উদাহরণে আপনি অহেতুক চিন্তা দূর করার জন্য অফিস থেকে আবার বাসায় এসে দরজায় ঠিকমতো তালা লাগানো হয়েছে কিনা তা দেখলেন।

ওসিডি রোগীর ক্ষেত্রে এই অবসেশন ও কম্পালশন অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন-সবসময় মনে হয় হাতে বা শরীরে কোনো ময়লা বা জীবাণু লেগে আছে। অনেকের মনে হয় সে বুঝি ক্যান্সার বা এইডসের মতো কোনো দূরারোগ্য রোগে ভুগছে। অনেকের আবার ঘরের আসবাবপত্র বা অন্যান্য জিনিস একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে না থাকলে অস্বস্তি লাগে। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম বা অন্য কেনো বিষয়ে অযাচিত কোনো চিন্তা বারবার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। বিষটা অসঙ্গতিপূর্ণ জানার পরেও রোগী তা সরাতে ব্যর্থ হয় ফলে মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত হয়, প্রচুর সময় ব্যয় হয়, অযাচিত চিন্তা দূর করতে না পারার কারণে হতাশ হয়, অস্থির হয়।

ওসিডির কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ জানা নেই। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের কিছু অংশের নিউরোক্যামিক্যাল তারতম্যকেই ওসিডির কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও বংশগত,পরিবেশগত,রোগজীবাণু অথবা ব্যক্তিজীবনের মানসিক চাপের কারণেও ওসিডি হতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়! কীভাবে বুঝবেন আপনি ওসিডিতে ভুগছেন।নিজেকে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন করুন।
আপনি কি অতিরিক্ত ধোয়ামোছা করেন?
আপনি কি কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত যাচাই-বাচাই করেন?
দৈনন্দিন কাজে কি অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়?
আপনার মাথায় অযাচিতভাবে কি কোনো চিন্তা আসে যা আপনি চাইলেও সরাতে পারেন না?
আপনার কি আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, নিত্য ব্যবহার্য জিনিস একটি নির্দিষ্ট রীতিতে সাজিয়ে রাখার প্রবণতা আছে?
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনি ওসিডির ঝুঁকিতে আছেন।এক্ষেত্রে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

• বাইপোলার ডিসঅর্ডার (Bipolar disorder)

বাইপোলার ডিসঅর্ডার (Bipolar disorder) মূলত একটি মানসিক অবস্থা যার ফলে ব্যক্তির দুইটি মানসিক পর্যায় বিষণ্ণতা এবং ম্যানিক (Manic) স্টেইজ বা অস্বাভাবিক রকম খোশমেজাজের পর্ব চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। বর্তমান শতকের মুড সুইং মূলত এই বাইপোলার ডিসঅর্ডার।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার দুইটি পর্যায় বা পর্ব থাকে। ম্যানিক স্টেজ এবং বিষণ্ণতা বা ডিপ্রেশন। ম্যানিক স্টেজে ব্যক্তি অত্যাধিক আনন্দিত বা ইতিবাচক থাকে।একে ম্যানিয়া বলা হয়।এই সময় অনেক কঠিন সিদ্ধান্তও ব্যক্তি খুব সহজে নিয়ে ফেলে। নিজের সামর্থ্যের বাইরে দান করা, কেনাকাটা করা, নিজেকে আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে হতে থাকে। যে মানুষটা সারাদিন নিজেকে গুটিয়ে রাখতো তার মনে হঠাৎ করে রাজ্যের চিন্তা চলে আসে।
আবার এর উল্টোদিকে থাকে বিষণ্ণতা বা ডিপ্রেশন। খুবই উৎফুল্ল থাকা ব্যক্তিটিই হঠাৎ করে খিটখিটে হয়ে যায়। প্রচন্ডরকম বিষণ্ণতা অনুভব করে। কারো সাথে কথা বলতে চাইনা। কোনো কাজে উৎসাহবোধ করেনা। কখনো কখনো ম্যানিক স্টেজে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্তের জন্য প্রচন্ড অনুশোচনাই ভোগে। এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাও চলে আসে। উভয় অবস্থাই কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস স্থায়ী হতে পারে।

বাইপোলার ডিসঅর্ডারের নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো জানা সম্ভব হয়নি। তবে মস্তিস্কের কারণ কিংবা বংশগত কারণেও এইরোগ হওয়ার উচ্চ-সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও মানসিক চাপ বা আঘাত এবং শারীরিক অসুস্থতাও এর কারণ হতে পারে।

বাইপোলার ডিসঅর্ডারের শারীরিক কোনো উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়না বিধায় এই রোগ নির্ণয় করা একটু কঠিন। তবে ব্যক্তির প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ বা মেজাজ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু পরীক্ষার মধ্যে তা বুঝা যেতে পারে।

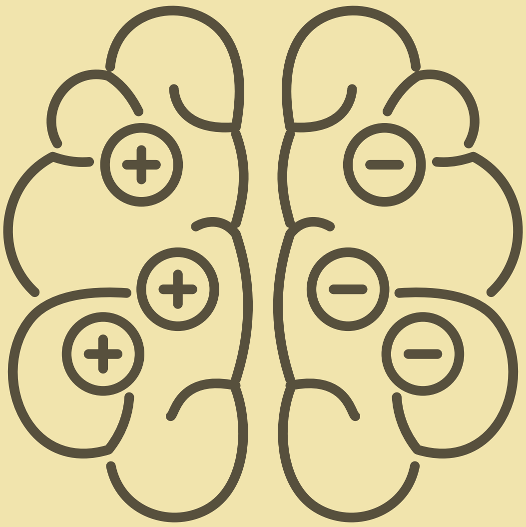

- ## বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (Borderline personality disorder)

মাঝেমাঝে আমরা মানুষের মধ্যে থেকেও শূন্যতাবোধ করি। আশেপাশের সাধারণ পরিস্থিতিও আমাদের বারবার ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে। নিজের চিন্তাভাবনা আবেগগুলোকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা। কিছুতেই যেনো স্থির থাকতে পারিনা। এমন অনেক সমস্যা বেশকিছু মানুষের মাঝেই কমবেশি দেখা যায়। কিন্তু যখন এসব অক্ষমতা বারবার ঘটতে থাকে এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী থাকে তাকলে সেটিকে বলা হয় বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (Borderline personality disorder) বা বিপিডি। যেটি একটি ব্যক্তিত্ব বিষয় মানসিক সমস্যা।

বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির আবেগ বা রাগ নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা খুবই কম।আবেগ বা রাগের বশে আত্মহত্যার চেষ্টাও এরা করে থাকে।যেকোনো বিষয়ে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং সিদ্ধান্ত হীনতার দ্বন্দ্বে ভুগে।
বিপিডি রোগীদের অধিকাংশ সময়ই নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার ভয়ও দেখা যায়।এমনকি প্রিয় মানুষের সামান্য দেরি করে ঘরে ফেরা তাদের মাঝে তীব্র ভয় সৃষ্টি করে। বিপিডি আক্রান্ত ব্যক্তি যেকোনো কিছুকে সর্বদা খুব ভালো বা খুব খারাপ এই দুইভাবে বিবেচনা করে। কখনো মাঝামাঝি চিন্তা করতে পারেনা। খুব বেশি মুড সুইং হতেও দেখা যায়। উচ্চ আশা আর উচ্চ হতাশার মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিচরণ করতে থাকে।এদের খুব সহজে সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলতেও দেখা যায়। নিজে কেমন, কি চায় অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট হয়। নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনাও অনেকক্ষেত্রে তাদের কাছে জটিল হিসেবে ধরা দেয়।

বিপিডির ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে অনেক সময় দায়ী করা হয়। জীবনের কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনা যেমন: মানসিক বা যৌন নির্যাতন, প্রিয় কোনো ব্যক্তি থেকে বিচ্ছেদ অথবা প্রচণ্ড অবেহলা বা তাচ্ছিল্য থেকে রোগটি জন্ম নিয়ে থাকে। এছাড়াও মস্তিস্কের অস্বাভাবিকতা এবং বংশগত কারণকেও দায়ী করা হয়।

• ডিপ্রেশন (Depression) বা অবসাদ

বর্তমান শতকে ডিপ্রেশনে (Depression) ভোগাটাই যেন স্বাভাবিক বিষয়। আধুনিকতার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে হচ্ছে অবসাদের শিকার।সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে সবাই ব্যস্ত হয়ে গেছে বুঝাতে যে সে ডিপ্রেশনে ভুগছে। এখন প্রশ্ন হলো এই ডিপ্রেশন আসলে কী? সাধারণ মন খারাপকে কি ডিপ্রেশন বলা যায়?
ডিপ্রেশন বা অবসাদ হলো মানসিক ভারসাম্যহীনতা, যা মানুষের চিন্তাভাবনা, আচরণ, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ডিপ্রেশনে ভোগা ব্যক্তি সবসময় দুঃখী, ক্লান্ত এবং অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের কোনো কাজেই ইচ্ছা বা মনোযোগ থাকেনা। অধিকাংশ সময় মনমরা মেজাজ বজায় থাকে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় আত্মহত্যা বা নিজের ক্ষতি করার চিন্তাও চলে আসে। সত্যিকারে ডিপ্রেশনে ভুগা ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়া তো দূরের কথা নিজের কাছের মানুষকেও এই ডিপ্রেশনের কথা বলতে চায়না।
ডিপ্রেশনের অনেকগুলো শারীরিক লক্ষণও প্রত্যক্ষ করা যায়।যেমন: ক্ষুধা, ঘুম, ওজন ইত্যাদি কমে যায়। রোগী অনেকসময় অস্থির বা অলস আচরণ করে। এছাড়া কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন: ভুলে যাওয়ার সমস্যা, আস্তে নড়াচড়া করা। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অবসাদের সাথে স্ট্রোক, হৃদরোগের সমস্যা থাকে।

দুঃখের ঘটনায় সাময়িকভাবে অসুখী বা মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তা যদি দীর্ঘ সময়ব্যাপী ঘনঘন ঘটে এবং স্বাভাবিক জীবন ও স্বাস্থ্যকে ব্যাহত করে তবেই তাকে ডিপ্রেশন বলা যাবে এবং এক্ষেত্রে তার চিকিৎসার প্রয়োজন।

জীবনের চাপ বা দুশ্চিন্তা ডিপ্রেশনের অন্যতম কারণ। অনেকসময় নির্ণয় না হওয়া অন্যান্য মানসিক ব্যাধি যেমন: অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, সোশ্যাল ফোবিয়া ও সিজোফ্রেনিয়ার রোগের পাশাপাশি অবসাদ বা ডিপ্রেশন প্রকার রূপে দেখা যায়। শারীরিক স্বাস্থ্যের সমস্যাও এর কারণ হতে পারে।

• স্লিপ ডিসঅর্ডার (Sleep disorder)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাকেই বলা হয় স্লিপ ডিসঅর্ডার (Sleep disorder)। এছাড়া ঘুমানোর সময় অস্বস্তি, ঘুমের ছন্দের পরিবর্তন অথবা ঘুমের সময় বাধার সৃষ্টি ইত্যাদি সমস্যাগুলোও স্লিপ ডিসঅর্ডারের সাথে সম্পর্কিত।
স্লিপ ডিসঅর্ডারের কারণের উপর ভিত্তি করে এর উপসর্গগুলোও বিভিন্নরকম হয়। তবে এর প্রধান উপসর্গের মধ্যে ঘুমের সময় অসুবিধা হওয়া, ঘন ঘন ঘুম ভাঙ্গা, সারাদিন ক্লান্তি বা ঘুম ঘুম ভাব, মনোযোগের অভাব, বিরক্তবোধ এবং উদ্বিগ্নতা বা অবসাদ ইত্যাদি দেখা যায়।
বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো গুরুতর রোগের কারণে স্লিপ ডিসঅর্ডার হয়ে থাকে। যেমন: বাইপোলার ডিসঅর্ডার, বিষণ্ণতা, অ্যালার্জির সমস্যা, গুরুতর ব্যথা, স্লিপ অ্যাপ্নিয়া (ঘুমানোর সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা) ইত্যাদির কারণে স্লিপ ডিসঅর্ডার হতে পারে। এসব রোগের চিকিৎসায় স্লিপ ডিসঅর্ডার নিরাময় করা সম্ভব। অন্যান্য ক্ষেত্রে ভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে।

বেশিরভাগ সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে রোগের ধরণ বা ভেতরের ধরণের কারণে রোগী এসব সমস্যার কথা কাউকে বলতে চায় না। সমস্যাটা কাউকে বলার মতো না এমনটা ভেবে নিজেই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে যার ফলে ফলাফল হয় উল্টো। বাস্তবতা হলো এইধরনের রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা খুবই প্রয়োজন। যতো তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু যায় ততো ভালো। ঔষুধ এবং সাইকোথেরাপির উভয়েরই প্রয়োজন। প্রয়োজনানুসারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এছাড়া আশাপাশের পরিবেশ, রোগীর খাদ্যাভ্যাস, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এসব রোগ নিরাময়ে বিরাট ভূমিকা রাখে।

লেখনীতে:
খাদিজা কাদের হিমা
ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ফোবিয়া!

অমূলক ভীতির আদ্যোপান্ত

বন্ধুমহলে এমন এক বন্ধুর কথা চিন্তা করুন তো, যে রাতভর হরর মুভি দেখে ভয় পায় না কিন্তু গলিতে কুকুর দেখলে উল্টোদিকে দৌড় দিয়ে বসে। অনেকের সাথে হয়তো মিলে যাচ্ছে আবার যাদের খানিকটা হাসি পাচ্ছে তারাও কিন্তু খুব একটা আলেকজান্ডার দি গ্রেট না! আমাদের অনেকেরই কোনো না কোনোকিছুর প্রতি ফোবিয়া বা ভয় কাজ করে। একটু ভুল বললাম, ফোবিয়া মানেই ভয় বা আতঙ্ক নয়। অভিধানের ভাষায় হয়তো দুটি সমার্থক কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায় ভয় মনের অবচেতন স্তরের এক বিশেষ মানসিক অবস্থা এবং এটি খুবই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু এর মান যখন স্বাভাবিকতা অতিক্রম করে অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে তখনই সেটি ফোবিয়া (ভীতিরোগ) বলে গণ্য করা হয়।

ফোবিয়ার ইতিহাস

"ফোবিয়া" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রোমান চিকিৎসক সেলসাস। তিনি হাইড্রোফোবিয়া (পানি ভীতি) শব্দটি ব্যবহার করেন যারা রাবি জাতির ভয়ে পানি পান করা থেকে বিরত থাকতো তাদের প্রতি। শব্দটি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন গ্রিক শব্দ ফোবাস (Phobas) হতে। গ্রিক পুরাণ মতে, ফোবাস ছিলেন এরিয়েস এর পুত্র যিনি ছিলেন গ্রিক যুদ্ধের দেবতা।

তবে সেলসাস কিন্তু প্রথম ফোবিয়ার ধারণা দেননি। এরও ৫০০ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক ও চিকিৎসক হিপোক্রেটিস তাঁর "The Seventh Book of Epidemics " এ নিকানোর নামে এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেন যে রাতে বাঁশির শব্দ শুনে ভয় পেত, অথচ দিনে একদম স্বাভাবিক থাকতো।

১৭৮৬ সালে এক লেখক কলম্বিয়ান ম্যাগাজিনে ফোবিয়া শব্দটি বিশ্লেষণ করেন এভাবে, "A fear of an imaginary, evil, or an undue fear of a real one." অর্থাৎ কোনো অদৃশ্য, অশুভ, অবাস্তব কোনো কিছুর প্রতি ভয়।

১৮ শতকের শেষের দিকে মেডিক্যাল সায়েন্টিস্টরা এসব সাইকোলজিক্যাল সমস্যা নিয়ে ভাবতে থাকেন। ১৮ শতকের শেষের দিকেই সিগমুন্ড ফ্রয়েড হান্স নামে একটি ছেলের ব্যাপারে লিখেন যে ঘোড়া দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিল।

ধীরে ধীরে সমসাময়িক বিশেষজ্ঞরাও বুঝতে শুরু করেন যে ফোবিয়া এক ধরণের মানসিক ব্যাধি।

কী কারণে হয় ফোবিয়া!

মানুষ জন্মগতভাবে ফোবিয়া আক্রান্ত হয় না। মানুষের আচরণ মস্তিষ্কের নিউরোকেমিক্যাল (Neurochemical) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিউরোকেমিক্যালের সঞ্চলনে তারতম্য ঘটলে আচরণে পার্থক্য দেখা যায়।

ফোবিয়ার সাধারণ কিছু কারণ-

➡ অতীতের কোনো দুর্ঘটনা মনে ভীতি সৃষ্টি করতে পারে। হতে পারে স্বচক্ষে মৃত্যুর স্বাক্ষী, লিফটে আটকে যাওয়া ইত্যাদি।

➡ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একই প্রকৃতির স্বভাব বা ভয়। যেমন ধরুন, আপনার পরিবারের সকলে খুব পরিচ্ছন্ন স্বভাবের, এর ফলে জীবাণুর প্রতি আপনার ফোবিয়া তৈরি হতে পারে।

➡ চাপ, অপমান, মানসিক যন্ত্রণা, বয়স বা অন্য কোনো কারণে শারীরিক অসুবিধে ব্যক্তিকে মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলে। তখন সে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা হারায়। এই দুর্বলতা মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনে, এই পরিবর্তন ফোবিয়ার আকার ধারণ করতে পারে।

➡ সাইকোসোমেটিক ডিসঅর্ডার (Psychosomatic Disorder) যেমন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ডায়াবেটিস এগুলো দীর্ঘস্থায়ী ফোবিয়ার জন্ম দেয়।

Aquaphobia

সোজা বাংলায় বললে পানির প্রতি অমূলক ভয়। এদের মধ্যে ভয় কাজ করে যে তারা ডুবে মারা যাবে বা স্রোতে ভেসে যাবে। অনেক সময় কল্পনায় এদের অ্যাকুয়াম্যান মুভির বিশাল অক্টোপাস 'ক্র্যাকেনের' মত কোনো কিছু গ্রাস করে নিয়ে যায়। ভয়ের তীব্রতা এত বেশি হয় যে পুলের পানি দেখলেও ভয়ে কাঁপে।

Social Phobia

সোশ্যাল ফোবিয়া মূলত বোঝায় সামাজিক ভীতি। ক্লাসে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেলে বা সভা-সেমিনারে একটু বক্তৃতা দিতে বললেই যেন আমাদের গায়ে কাপুঁনি দিয়ে জ্বর আসে। মূলত কমবেশি সবার মধ্যেই এই কথা বলার জড়তা বা সামনাসামনি মিশতে পারার ব্যর্থতা রয়েছে। কিন্তু সবার সামনে কথা বলার এই ভীতি যখন আপনার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠবে তখনই তা কেবল ফোবিয়া বলে গণ্য হবে। এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি কেবল মনে করে তার গতিবিধি সার্বক্ষণিক কেউ যেন নজরে রাখছে, এই বুঝি সে কি বলতে কি বলে ফেললো এবং সবাই তাকে কোণঠাসা করছে। এই ভীতির দরুণ সে সর্বদা জনসমাগম এড়িয়ে চলে, এমনকি সে কারো সাথে ফোনালাপ করতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনা। মূলত কৈশোর বয়স থেকে মানুষের মাঝে এই ফোবিয়ার লক্ষণ সমূহ দেখা যায়।

Hemophobia

হেমো শব্দের পারিভাষিক অর্থ "রক্ত"। আর রক্তের প্রতি ভীতিই হলো হেমোফোবিয়া। অনেক ব্যক্তিই আছেন যারা সিনেমায় বা টেলিভিশন এর পর্দায় রক্ত দেখলেই জ্ঞান হারান। অনেকের কাছে ব্যাপার টা হাস্যকর ঠেকলেও এটি একটি অন্যতম ভয়ংকর ফোবিয়া। এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ত দেখলে বা রক্তদান করতে বা রক্ত সম্পর্কিত চিকিৎসা সেবা নিতেই মারাত্মক ভয় পান। রক্ত দেখলেই তাদের হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ বেড়ে যায়, অনেকের শ্বাস-প্রশ্বাসে ও ব্যাঘাত ঘটে। এটি মূলত জেনেটিক সমস্যা, তাই এই প্রজন্মের কারো এই ভীতি থাকলে তা পরবর্তী প্রজন্মেও স্থানান্তরিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় একে বলা হয় ভ্যাসোভ্যাগাল সিনকোপ বা নিউরোকার্ডিও জেনিক সিনকোপ।

Auto phobia

এই ফোবিয়ার আরো নানা ভিন্ন নাম আছে। যেমন- মনোফোবিয়া, আইসোলোফোবিয়া ইত্যাদি। এই ফোবিয়ার বাংলা অর্থ "একাকিত্ব ভীতি"। বর্তমান প্রেক্ষিতে এই ফোবিয়া বা ভীতির মাত্রা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আশেপাশে হাজারো মানুষের ভীড়েও কেমন যেন নিজেকে খুবই একা মনে হয়। নিজের মধ্যে পাহাড় সমান দুঃখ কষ্টের স্তূপ বানাতে থাকি, কিন্তু এমন কাউকে পাওয়া যায় না যার মাঝে মিলবে দুদণ্ড প্রশান্তি। আর এই আধুনিক তথা যান্ত্রিক যুগে মানুষে মানুষে বাড়ছে দূরত্ব যা ক্রমেই বাড়িয়ে দিচ্ছে একাকিত্ব ভীতি, যার ফলাফল খুবই সর্বনাশা। এই ভীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি চরম হতাশার গ্লানি টানতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই বেছে নেয় আত্মহননের পথ। মানুষের সাথে সর্বাধিক যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে এই ভীতি কিছুটা হলেও লাঘব করা যায়।

নির্দিষ্ট ফোবিয়া বিকাশের কারণ

সাধারণত কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোনো ফোবিয়া থাকলে তা তার বয়সের সাথে সাথে প্রকাশিত হতে শুরু করে। গড়ে ১০ বছরে থাকতে একজন ব্যক্তি তার মধ্যে থাকা এই ভয়ংকর ব্যাধি সম্পর্কে অবগত হয়। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার মধ্যে থাকা ফোবিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকট হতে থাকে। তাছাড়া ফোবিয়ার ঝুঁকি বাড়ার আরো সমূহ কারণ রয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু ফোবিয়া জেনেটিক, তাই পরিবারের কোনো সদস্যের কোনো বিশেষ ফোবিয়া থাকলে তা অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা ও অধিক। আবার ধরা যাক, হেমোফোবিয়ায় আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি রক্ত দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। পরিবারের কোনো শিশুসদস্য তা লক্ষ করে রক্ত দেখলে অনুরূপ ভীতি অনুভূত করার চেষ্টা করে। এভাবে পরিবারের সদস্যদের আচরণ অনুকরণ করেও ফোবিয়ার মাত্রা বিকশিত হতে পারে। আবার ধরুন, উচ্চতা ঝুঁকি আছে এমন কোনো ব্যক্তির নিকট হতে আপনি জানতে পারলেন পাহাড় বা উঁচু জায়গাই উঠলে তার কেমন ভীতি অনুভুত হয় এবং কী কী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়- ফলে আপনিও যদি পাহাড় ভ্রমণে যান,তখন দেখতে পাবেন আপনার আগে উচ্চতা ভীতি না থাকলেও এখন কেমন জানি ভয় ভয় করছে। এভাবে কোনো ফোবিয়া সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবনা আপনার মাঝে ফোবিয়ার বিকাশ ঘটাতে পারে।

চিকিৎসা!

কারো মাঝে যদি ফোবিয়ার উদ্বেগ থাকে তাহলে প্রথম কর্তব্য হলো অভিভাবক কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সাথে আলোচনা করা।
ফোবিয়ার চিকিৎসা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন রকম হতে পারে,এজন্য সাইকোথেরাপিস্ট এর শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়। তবে সাধারণ কিছু ট্রিটমেন্ট যেমন: সাইকোথেরাপি, রিলেক্সেশান টেকনিক সাইকো থেরাপিস্টরা সাজেস্ট করেন।

সাইকোথেরাপি

সাইকোথেরাপির মাঝে এক্সপোজার থেরাপি ও কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি সবথেকে কার্যকর। আপনি যে বিষয় নিয়ে ফোবিয়ায় আক্রান্ত এ থেরাপিগুলো ওই বিষয়ে আপনার অনুভূতি, চিন্তাচেতনা, আচরণ বদলানোর মাধ্যমে উদ্বিগ্নতা কমাতে সাহায্য করে।

রিল্যাক্সাশান টেকনিক

এ টেকনিকগুলো আপনার দেহ শান্ত রাখতে সাহায্য করবে। যেমন যোগব্যায়াম, মেডিটেশন, শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ-এগুলো হয়তো পুরোপুরি ফোবিয়া নিরাময় করবে না, কিন্তু ফোবিয়ার লক্ষণ কমাতে অনেকখানি সাহায্য করবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য মানুষের অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড আমাদের মনে যতখানি চিন্তার উদ্রেক ঘটায় তার থেকে বেশি আমরা হাসি ঠাট্টার মাধ্যম হিসেবেই নি। ফোবিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি আমাদের সভ্য সমাজ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার পরিবর্তে তা বরং লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একজন শিশু একটুখানি ভুল করলে আমাদের শিক্ষক ও অভিভাবক যেভাবে শাস্তি প্রদান করেন তাতে শুধরানোর বদলে ভীতিটাই বাড়িয়ে তোলেন।
একুশ শতকে এসেও বৈজ্ঞানিক যুক্তির চেয়েও নিজেদের মনগড়া ভীতি ও কুযুক্তি আমাদের কাছে অধিক যুক্তিসঙ্গত। তাই আসুন, নিজেদের মধ্যে এ কিঞ্চিত সচেতনতাবোধটুকু জাগিয়ে তুলি। ফোবিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি যেন আমাদের কাছে বিনোদন এর মাধ্যমে পরিণত না হয়, তা মাথায় রাখতে হবে। সেই সাথে বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা বাড়ানো দরকার। তবেই আমরা পাবো সুস্থ, সুন্দর এক পৃথিবী।

লেখনীতে:
আফরোজা সুলতানা মনি, ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
মুহাম্মদ, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

সিনড্রোমস্ ও মিথস্

আমাদের আশেপাশে বেশ কিছু অপরিচিত বৈশিষ্ট্য ঘুরপাক খায়- যার কিছু মানসিক জটিলতা হলেও গতানুগতিক কিছু ভুল ধারণা দিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করে বসি। মানসিক সিন্ড্রোম মূলত অনেকগুলো অনিয়মিত লক্ষণের একত্রিত বহিঃপ্রকাশ, যেগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে তা ইতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে পারো তুমিও ! আবার রূপকথার নকশার মতো গল্পে গল্পে তৈরি হওয়া অনেক ব্যাপার কালক্রমে পরিণত হয়েছে বিশ্বাসে- যেগুলোকে বলা হয় মিথ। চলো জেনে নেওয়া যাক কিছু সিন্ড্রোম ও মিথ সম্বন্ধে !

১) লার্নিং স্টাইলস্ মিথ

নতুন কিছু শিখতে বরাবরই আমাদের সবার এক বড়সড় আগ্রহ কাজ করে, হোক সেটা একটুখানি বিজ্ঞান অথবা অনেকখানি প্রযুক্তি। শেখার ক্ষেত্রে আমরা কেউ হয়তো ছবি এঁকে বিষয়গুলো বুঝতে ভালোবাসি, আবার কেউ হয়তো বারবার লিখে মাথায় রাখি। ধীরে ধীরে আমাদের একটি নিজস্ব লার্নিং স্টাইল তৈরি হয়ে যায়, তাই কেউ আমাদেরকে কিছু শেখাতে চাইলেও আমরা ওই নির্দিষ্ট নিয়মটিতেই সায় দিই।

তোমার মনে হতে পারে নির্দিষ্ট সেই শিখনপ্রক্রিয়াটিই তোমার নতুন বিষয় রপ্ত করা বা মনে রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে - আসলে ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়! একজন শিক্ষক অনেকভাবেই তোমাকে তার ঝুলিতে রাখা চমৎকার বিষয়গুলো শেখাতে পারেন এবং সময়ভেদে প্রক্রিয়াগুলোর কাজ করার মাত্রাও ভিন্ন হয়। এক জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৮৯.১ শতাংশ মানুষ তাদের নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্যের শিখনপ্রক্রিয়ার চেয়েও নতুন ইন্সট্রাকশনে ভরপুর বিষয় শিখে নেয় বেশ দ্রুত!

তাই তোমার যদি পড়াশোনা বা অন্য যেকোনো কিছু শেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম থেকে থাকে, তবে মাঝেসাঝেই তা পরিবর্তন করে আগাতে পারো নতুন নিয়মে। এতে তোমার মস্তিষ্কের ব্যায়ামটা যেমন হবে, শেখাটাও হবে দারুণ!

২) ইলিয়জম

রিফাত বন্ধুদের সাথে আড্ডায় প্রায়ই নিজেকে "সে" বলে সম্বোধন করে। অনেক আমি-তুমির ভিড়ে রিফাতের নিজস্ব ভিন্নতা নজরে পড়ে অনেকেরই, তেমনটাই নজর এড়ায়নি বন্ধু আরিয়ানেরও। বাসায় ইন্টারনেট ঘেঁটে খানিকটা পড়াশোনা করে জানতে পারে কোনো বক্তব্য বা কথোপকথনে নিজেই নিজেকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপনের প্রবণতা কাজ করে অনেকের মাঝেই, যেটিকে মনোবজ্ঞানীরা পরিচিতি দেন 'ইলিয়েজম' হিসেবে।

অনেকের ক্ষেত্রেই তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করাটা মূলত পুরনো অনুভূতির মায়াজাল। অনেকে নিজের অতীতের ভুলগুলো যাচাইয়ের জন্য অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে ক্রমাগত বিচার করতে থাকে, ফলে ধীরে ধীরে তার "আমিত্ব" এর সাথে তৃতীয় একটি অবিচ্ছিন্ন অংশের সংযোগ দেখা দেয়। আবার অনেক সময় সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের অনুপস্থিতিতেও দেখা দেয় ইলিয়েজম,

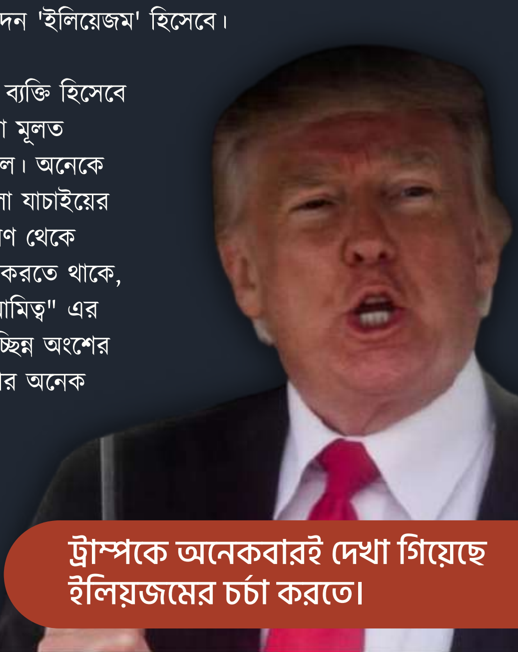

ট্রাম্পকে অনেকবারই দেখা গিয়েছে ইলিয়জমের চর্চা করতে।

যেমন অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মাঝে। তুমি যদি কোনো বন্ধু বা ব্যক্তিকে ইলিয়েজম ব্যবহারে লক্ষ করো, তবে মনে রেখো সেটিও স্বাভাবিক। তার নিজস্ব আঙ্গিকও তার মতোই সুন্দর, নিপুণ।

গড়ে তুলতে হবে যেন ভবিষ্যতে তারা বাবা-মার উপর কোনো জোরপূর্বক প্রভাব সৃষ্টি না করে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে যেকোনো পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারে।

৩) ম্যানিপুলেশন মিথ

এখনো ছোটবেলা পার করছে এমন শিশুদের মাঝে প্রায়ই কান্নার রেশ দেখা যায়। এভাবে তারা তাদের বাবা-মাকে তাদের আবদার পূরণ করতে বাধ্য করে। যেমন ছোট্ট প্রিয়ন্তী তার খেলার চাদরে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলেও মায়ের কোলে ওঠার জন্য কান্না জুড়ে দেয়। যে প্রক্রিয়ায় বাচ্চারা এভাবে বাবা-মাকে প্রভাবিত করে তাকে বলা হয় 'ম্যানিপুলেশন মিথ' (Manipulation Myth)। এই কান্না করা বা রাগে চিৎকার করার জন্য অনেকে মনে করেন শিশুরা জন্ম থেকেই তাদের বাবা-মাকে দক্ষভাবে পরিচালনা করে। এ অপ্রাসঙ্গিক বিশ্বাসের কারণে শিশু যখন কোনো কারণে কাঁদতে থাকে, তখন অনেক বাবা-মা নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তাকে অবহেলা করে অথবা শাস্তি দেয়। কিন্তু একটা শিশুর পক্ষে পরিকল্পিতভাবে তার বাবা-মাকে পরিচালনা করা অসম্ভব, কেননা শিশুর মস্তিষ্ক তখনো প্রকল্পিত চিন্তা-ভাবনা করার জন্য পরিপক্ব হয়ে উঠেনি। মূলত শিশুরা কান্না করে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা অথবা তার প্রয়োজন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার অনুপস্থিতি থেকে। তাই শিশুদেরকে শাস্তি না দিয়ে তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে

> “তার নিজস্ব আঙ্গিকও তার মতোই সুন্দর, নিপুণ।”

৪) বৈপরীত্যের বন্ধন

ইলেক্ট্রন প্রোটনের বিপরীত আয়নে আকর্ষণের রসায়ন আমাদের সবারই বেশ পরিচিত, এবং তাতে মনে হতে পারে বৈপরীত্য হয়তো আমাদেরও ধরে রাখে কাছাকাছি - তবে তা কতটা সত্যি?

রূপকথার রাজ্যে বিপরীতমুখী মানসিকতার মাঝেও দেখা যায় তুমুল বন্ধুত্ব। চলচ্চিত্র জগতেও উঠে এসেছে অপোজিট এট্রাকশনের নানা শিল্প। তোমার-আমার বয়সী যারা আছি, আমাদের মাঝে প্রায় ৮০ শতাংশেরই মতামত অনুযায়ী বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তৈরি হয় দৃঢ় বন্ধন।

এ মায়ার রহস্যোদ্ধারে নেমে পড়েন মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা। কয়েক দশকের পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারেন অপোজিট এট্রাকশন কেবলই একটি মিথ ; বিপরীত আকর্ষণের তীব্রতা খুবই কম এবং এর মাধ্যমে তৈরি ভালো সম্পর্ক বেশ দুষ্প্রাপ্য। কারণ মানুষ সামাজিক জীব এবং সে কারো সাথে নিজের মতামতের মিল খুঁজে পেলে সেটিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এতে তার মঝে পরিচিত চিন্তাগুলোই ঘুরপাক খেতে থাকে এবং সে নিজেকে অনুভব করে নিরাপদ। নিজের আনন্দ বা নমনীয়তার অনুভূতিগুলোই পুনরায় পুনরায় তৈরি হতে থাকে, ফলে যাদের কাছে সে সহজে প্রশান্তি খুঁজে পায় তাদের সংস্পর্শই যোগ হয় ভালো লাগার সূচীপত্রে।

> **বুদ্ধিগত প্রতিবন্ধকতা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, কিন্তু লজ্জার বিষয় নয় মোটেও। শিশুকে আস্থা জুগিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে সবারই।**

অপর দিকে বিপরীত মানসিকতা তাকে নিয়ে আসে সামাজিক কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে। নিজস্ব ধারণাসমূহের খোলস ভেঙে যেতে থাকলে তার মনেও নাড়া দেয় নেতিবাচক অনুভূতি এবং সে খুঁজতে থাকে একরত্তি স্বস্তি। ফিলিংস রেগুলেশনের বিপরীত ভাঁজ তাকে দাঁড়া করায় জীবনের সার্ভাইভাল মোড়ে, তাই ভেঙে পড়ে বন্ধনগুলোও। কিন্তু যে মানুষগুলোর সাথে তার মতামত, চিন্তাধারা বা আনন্দের কারণটুকুও মিলে - তাদের কাছেই সে থাকে চঞ্চল, হাসে প্রাণভরে।

৫) মানসিক প্রতিবন্ধকতা

মানসিক প্রতিবন্ধকতা কোনো অসুখ নয় , এটা অবস্থান..
বুদ্ধিমত্তা বয়স অনুপাতে বাড়ে না ,ফলে স্বাভাবিক সমবয়সী ছেলেমেয়েদের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে। জন্মগত, গর্ভকালীন সমস্যা, মায়ের অপুষ্টি এবং পুষ্টিহীনতা,
মায়ের ডায়বেটিস, মানসিক ও শারীরিক রোগ থাকা- প্রভৃতি মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণ।

আইকিউ ৮৫ এরও হলে বুদ্ধিগত প্রতিবন্ধকতার শিকার বলে অভিহিত করা যায়।

মূলত জন্মের পরই ৬-১২ মাস বয়সের মধ্যে উপসর্গগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
রোগের প্রথম প্রকাশ অপূর্ণাঙ্গ আচরণ, বুদ্ধিজীবী উন্নয়নে বিলম্ব স্ব-সেবা অপর্যাপ্ত দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত।

করণীয়:- শিশুর সমস্যাগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। শিশুকে বকাঝকা, তাচ্ছিল্য কিংবা বিদ্রূপ না করে তার প্রতি সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল হতে হবে। শিশুকে বেশি আগলে রাখবেন না, এতে তার নিজের উপর আস্থা হারিয়ে যেতে পারে।

বুদ্ধিগত প্রতিবন্ধকতা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, কিন্তু লজ্জার বিষয় নয় মোটেও। শিশুকে আস্থা জুগিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে সবারই। গর্ভাবস্থায় নারীর সঠিক যত্নের মাধ্যমে এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিক ভাবে সহযোগিতা করলে তারাও সমাজে সুন্দর ভাবে বেচেঁ থাকতে পারবে।

লেখনীতে:
হোয়াইট বোর্ড সায়েন্স ক্লাব একাডেমিক টিমের নেতৃত্বে,
আঈশা নূর,
ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

ঘুমের মনস্তত্ত্ব

ঘুম! কি প্রশান্তির এক বার্তা। কিন্তু ঘুমকে ভালোভাবে ঘুমানোর জন্য মন ফুরফুরে থাকাটাও খুব জরুরি। ঠিক এখানটায় এসেই ঘুমের দায়িত্ব নিয়ে নেয় মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, মন ভালো না থাকলে ঘুমের মাসীও যেন শান্তিটুকু জমিয়ে রাখেন নিজের কাছে। পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুমের উপর নির্ভর করে মানুষের স্নায়ুচাপ(স্ট্রোক), রক্ত চলাচল, ডায়াবেটিস, ডিপ্রেশন, স্থূলতা, হার্টের রোগ, কাজ করার ইচ্ছা – এক কথায় প্রায় সব "ভালো কিছু"। তাই ঘুমের প্রয়োজনীয়তার সাথে মানসিক সম্পৃক্ততাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

"WHO (2020) এর এক প্রতিবেদন, যেখানে বাংলাদেশের প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষ ডিপ্রেশনের সাথে লড়ছে প্রতিনিয়ত।"

সকালের পত্রিকা খুলতেই ক্লোরার সামনে উঠে আসে WHO (2020) এর এক প্রতিবেদন, যেখানে বাংলাদেশের প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষ ডিপ্রেশনের সাথে লড়ছে প্রতিনিয়ত। পাতা ঘুরতেই চোখে পড়ে ঢাকা ট্রিবিউন জরিপ, বলা হয় বাংলাদেশের প্রায় 17% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মানসিকভাবে ভালো নেই। onlinelibrary.wiley এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বাংলাদেশের 24টি জেলার 3968 জন মানুষের উপর পরীক্ষায় ক্লোরার মতোই স্কুলপড়ুয়া শিশুদের যেখানে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানোর প্রয়োজন সেখানে 55% এরও বেশি শিশু এর কম সময় ঘুমায়। অপরদিকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের 28.2% এরও বেশি মানুষ ঘুমায় তাদের প্রয়োজনের বেশি। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন। কম বা বেশি ঘুম, কোনোটাই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। ঘুম যেমন আমদের চাপ, ক্লান্তি থেকে নিষ্ক্রান্ত করে ঠিক উল্টোভাবে ঘুমের ডিজঅর্ডারগুলোর কারণে আমাদের দেহে ক্লান্তি, ভালো না লাগা ভর করে। ঘুমের সমস্যাগুলো জড়তা হয়ে দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসক বা সাইকিয়াট্রিস্টদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত, যা আমাদের স্লিপ ম্যানেজমেন্টে সাহায্য করবে। ভালো ঘুমের জন্য যে ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে-

ভালো ঘুমের জন্য অবশ্যই তোমার ঘুমের জায়গাটিকে পরিষ্কার, অন্ধকার, নাতিশীতোষ্ণ রেখো। আর হ্যাঁ, অবশ্যই ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি যতটা সম্ভব দূরে রাখতে হবে, কেননা টিভি বা মোবাইলের স্ক্রিনের আলো দেহের জৈবঘড়ি নিয়ন্ত্রক মেলাটোনিন হরমোন নিঃসরণে প্রভাব ফেলতে পারে।

যতটা সম্ভব চিন্তামুক্ত হয়ে বিছানায় যাওয়ার চেষ্টা করবে, এতে তোমার হাসিও হবে আরও প্রাণবন্ত।

ঘুমানোর যেকোনো নির্দিষ্ট রুটিন মানলে সুফল পাওয়া যায়। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে, ধরে রাখতে হবে ছুটির দিনেও।

দুপুরবেলা বা অন্য সময়ে হালকা ঘুমিয়ে নেয়ার যে অভ্যাসটুকু নিতে হবে বদলে, কেননা এতে রাতের বেলা ভালো ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে। এগুলো ইনসমনিয়ার জন্য দায়ী। এতে ক্রনিক ইনসমনিয়াও হতে পারে যা দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ঘুমের এ মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানটুকু ঘুমের ফিজিওলজির সাথেও সম্পর্কিত। ঘুমকে প্রধানত দুই ভাগে দেখা যায় REM (rapid eye movement) এবং NREM (non rapid eye movement)। সম্পূর্ণ ঘুমের দশাকে সাধারণত 4 টি স্তরে ভাগ করা যায়

N1, stage 1 (nrem sleep)
সময়কাল: 1 – 5 মিনিট

কাজ: এই স্টেজে মানুষের ঘুমের শুরু হয় কেবল, ঝিমুনি দিয়ে তারা ঘুমে ঢলে পড়ে। রাত বাড়ার সাথে সাথে এই স্টেজের সময়কালও কমতে থাকে।

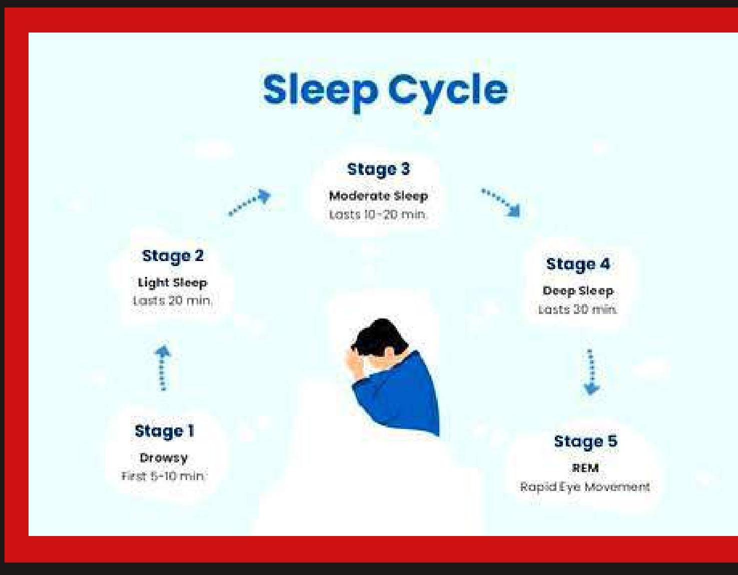

ঘুমের ধাপগুলো

N2, stage 2 (nrem sleep)
সময়কাল: 10 – 60 মিনিট

কাজ: এই স্টেজে শরীর অনেকটা শান্ত হয়ে পড়ে। শরীরের পেশীগুলো শান্ত হয়ে যায়, চোখের নড়াচড়া বন্ধ হতে শুরু করে (Nrem phase), শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে হার্টবিটও কমে যায় খানিকটা। ঘুমের প্রথম দিকে এই স্টেজ 10 – 25 মিনিট স্থায়ী হয়। ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে।

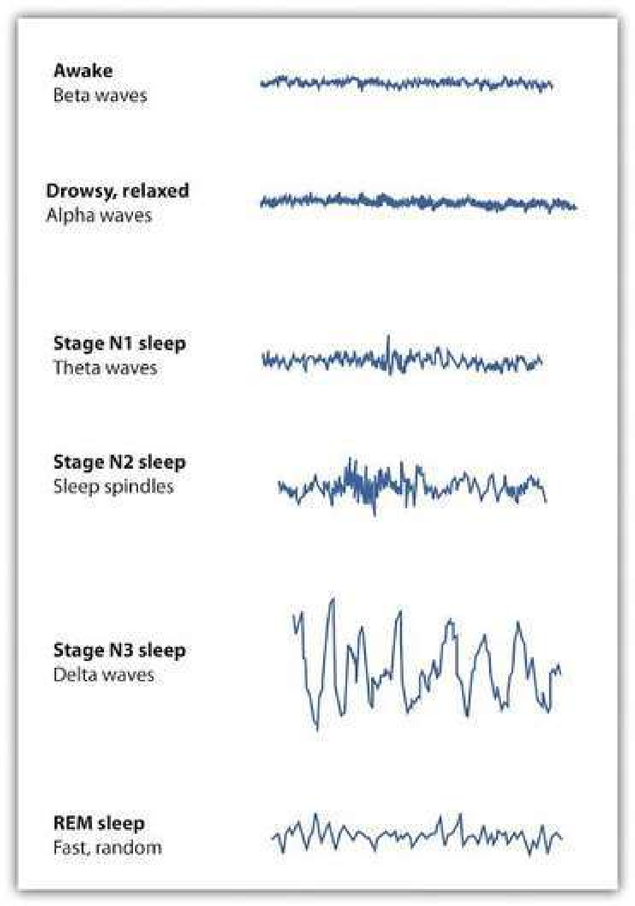

ঘুমের ধাপগুলোতে ব্রেইন প্যাটার্নের EEG রেকর্ডিং

N3, stage 3 (nrem sleep) এই স্টেজকে Delta Sleep বা Deep Sleep ও বলা হয়। সময়কাল: 20 – 40 মিনিট

কাজ: এই স্টেজেই মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন এই স্টেজেই মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, সৃজনশীলতার বিকাশ, স্মৃতিশক্তির বিকাশ, দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার হওয়া সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। রাত বাড়ার সাথে এই স্টেজের সময়কাল কমতে থাকে এবং REMS এ বেশি সময় ব্যয় হয়।

> সম্পূর্ণ ঘুমের প্রায় 25% REM দখল করে।

N4, stage 4 (rem sleep)
সময়কাল: 10 – 60 মিনিট।

কাজ: এই স্টেজে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় থেকেও অনেকটা "জেগে থাকে" এমনটা হয়। কারণ, এই অবস্থায় মানুষের চোখ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের পেশি ব্যতীত অন্যান্য পেশিসমূহ অনেকটা প্যারালাইজড অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ চাইলেও তা নাড়ানো যাবে না। এই অবস্থার নাম ATONIA। চোখের পেশি নড়াচড়া করে বলে একে Rapid eye movement sleep বলে। এই স্টেজেই মানুষের জ্ঞানভিত্তিক কিছু কাজ হয়ে থাকে (সৃজনশীলতা, শেখার ক্ষমতা ইত্যাদি)। এই স্টেজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই স্টেজেই আমরা আমাদের "সেই রঙিন স্বপ্ন" দেখে থাকি। যদিও যেকোনো স্টেজেই স্বপ্ন দেখা যায় কিন্তু এই স্টেজেই তা ধরা দেয় সবচেয়ে বেশি। ঘুমের প্রথম দিকে এই স্টেজের সময়কাল কম হলেও রাত বাড়ার সাথে সাথে তা অনেক বেড়ে যায়। সম্পূর্ণ ঘুমের প্রায় 25% REM দখল করে।

এই চারটি স্টেজ মিলে একটি সাইকেল তৈরি করে। ঘুমের সম্পূর্ণ অংশ কয়েকটি সাইকেলে গঠিত।

কিন্তু আমরা স্বপ্ন কেন দেখি?

এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া মুশকিল, যদিও অনেক ধরনের কারণ এর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। তবে এটা সত্য যে আমাদের সারাদিনের কাজ ও চিন্তাভাবনার প্রভাব পড়ে স্বপ্নে। জেগে থাকা অবস্থায় হয়তো আমরা কোনো কিছু চেয়ে বসছি কিন্তু পারছি না, দেখা যায় স্বপ্নে আমরা সেটির সমাধানও বের করে ফেলছি। বলতে গেলে স্বপ্ন হলো সাইকোলজির একটি বিশাল জগৎ। অনেকের মতে স্বপ্নে মস্তিষ্কের Amygdala নামক অংশ জেগে থাকা অবস্থার চেয়ে ঘুমন্ত অবস্থিত বেশি কার্যকর এবং এর কাজ হলো সহজাত চলাফেরায় সাহায্য করা। REM স্টেজে দেহের পেশি atonia অবস্থায় থাকে বলে হয়তো ঘুমের মধ্যে আমরা সাধারণত দৌড়াদৌড়ি করি নাহ। তবে ব্যতিক্রম আছে অবশ্যই।
একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অনেক সময় স্বপ্ন যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। বাস্তবে সেই স্বপ্নের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি ঘটে ব্রেইনের neocortex এর dorsolateral prefrontal area (dlPFC) অঞ্চলের জন্য। এটিই মস্তিষ্কের সিলেকশন এবং অ্যাক্টিভেশনের কাজ করে থাকে। REM স্টেজে এটি নিষ্ক্রিয় থাকলেও 40 হার্টজ তড়িৎ ইম্পালস এর ফলে এটি সক্রিয় হয়ে যায় এবং

আমাদের স্বপ্নকে “ইচ্ছেমতো সাজানোর” রসদ দিয়ে দেয়।

ঘুমের মনস্তত্ত্ব নিয়ে তো বেশ কথা হলো, তবে ঘুমের মাঝে হাঁটাহাঁটির ব্যাপারটা?

“SLEEPWALKING” বা “SOMNUMBOLISM”

Sleepwalking হওয়ার অন্যতম কারণের মধ্যে পড়ে বংশগত ধারা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অসুস্থতা, ঘুমের পরিবেশের পরিবর্তন ইত্যাদি। সত্যি বলতে ঘুমে হাঁটা অনেকটাই সাধারণ, বিশ্বে প্রায় 18% মানুষের এমনটা হতে পারে। সাধারণত ঘুমানোর এক-দুই ঘণ্টার মধ্যে স্লিপওয়াকিং হতে পারে। তবে এ ধরনের অবস্থার পরিত্রাণের জন্য ঘুমের একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা, শান্ত হয়ে ঘুমানো , চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করা খুব জরুরি। সমস্যাটুকু ক্রমাগত তোমার স্বাচ্ছন্দ্যের আঘাত হলে অবশ্যই সাইকিয়াট্রিস্টদের শরণাপন্ন হতে হবে।

ঘুম মানুষের জন্য কতটা জরুরি তা সকালে একটি বাজে ঘুম দেয়ার পর বোঝা যায়। দিনের শুরুতে ঘুম ভাঙাটা যদি চাই সুন্দর হোক, তবে ঘুমানোর প্রক্রিয়াটাও হতে হবে নির্মল সুন্দর। তোমার প্রাণবন্ত দিনটার পুঁজিটাও যেন হয় চমৎকার!

সোর্স: ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক, স্লিপ ফাউন্ডেশন, হেলথলাইন, এপিএ।

লেখনীতে:
এনামুল হক জুয়েল
চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

সাই-মিমস্

WHITE BOARD SCIENCE CLUB

WE ARE CALLING YOU FOR BEING A DESIGNER

COME AND JOIN US
DESIGN THE CLUB'S MESSAGES
UTILIZE YOUR DESIGNING POTENTIAL
ENRICH **YOUR SKILLEST** AND EXPERIENCE
PRODUCE CONCEPT AND **IDEAS**
TO WORK **HAND IN HAND** WITH THE DESIGN TEAM
DELIVER **INNOVATION MOTION** GRAPHIC CONTENT
AND MANY MORE

APART FROM THESE, WBSC MEMBERS GET RESEARCH AND INTERNSHIP OPPORTUNITIES, SKILLSET TRAINING SESSIONS, ARRANGE FUN MEETUPS AND WORK TOGETHER OUTSIDE THE CLUB FOR HUMANITY'S BETTERMENT.

আত্মশুদ্ধির পথে আত্মবিসর্জন?

আলোচনায় যাওয়ার আগে যা জানা দরকার

২০২১ এর সেপ্টেম্বর মাসে খবরের কাগজগুলোতে একটি অত্যন্ত আতঙ্কজনক জরিপের খবর প্রকাশ পেতে দেখা যায়। জরিপটি করেছে আঁচল ফাউন্ডেশন যার তথ্য মতে, ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ হতে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত দেশে ১৫১ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার তালিকাতে সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে স্কুলশিক্ষার্থীদের নাম, যা ছিল প্রায় ৭৩ জন।
বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের এত বেশি আত্মহত্যার সংখ্যা আগে তেমন একটা দেখা না গেলেও এই প্রবণতা এই দেশে নতুন নয়। পড়াশুনার চাপ, প্রতিযোগিতা, মানসিক বিষন্নতা, প্রেমে ব্যর্থতা, পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণ উঠে আসে আত্মহত্যার পেছনের গল্পগুলোতে, এবং এর ভিত্তিতে অবশ্যই মনে প্রশ্ন আসে যে এসবের সমাধান কি?

পড়াশুনার চাপ, প্রতিযোগিতা, মানসিক বিষন্নতা, প্রেমে ব্যর্থতা, পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণ উঠে আসে আত্মহত্যার পেছনের গল্পগুলোতে, এবং এর ভিত্তিতে অবশ্যই মনে প্রশ্ন আসে যে এসবের সমাধান কি?

১৮৯৬ সালের মার্চের ঘটনা, আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী লাইটনার উইটমার (Lightner Witmer) তখন ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সেলভেনিয়াতে পাবলিক স্কুল শিক্ষকদের পড়াতেন, ট্রেনিং দিতেন। সে মাসে তার সামনে একটা বিশেষ কেস আসে যেখানে সে দেখে যে একটা ১৪ বছরের শিক্ষার্থীর বানান করতে খুব বেগ পেতে হচ্ছে, যদিও সে অন্যান্য বিষয়ে বেশ পারদর্শী ছিল। এই চ্যালেঞ্জ সমাধানে তিনি ক্রমশই শিক্ষার্থীদের উপর কাজ করা শুরু করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়েই গড়ে তোলেন বিশ্বের প্রথম সাইকোলজিকাল ইউনিট। তখন থেকেই স্কুল সাইকোলজির ব্যাপারটার গুরুত্ব মানুষ বুঝতে শুরু করে এবং ২০০০ সাল নাগাদ এক আমেরিকাতেই ২০০ এর বেশি প্রোগ্রাম চালু হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এক লক্ষ ২৪ হাজারের বেশি, কিন্তু আফসোসের বিষয় তার বেশিরভাগেই নেই কোনো মনোবিজ্ঞানী।

দি আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশনের মতে স্কুল সাইকোলজি হলো এমন ধরণের সাইকোলজিকাল প্র্যাক্টিস যার মূল ফোকাস থাকে শিশু, যুবসমাজ, পরিবার এবং গোটা স্কুলিং সিস্টেম। সাধারণত স্কুল সাইকোলজিস্টরা বাচ্চা এবং যুবসমাজের শেখার প্রক্রিয়া এবং নানা আচরণীয় সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে। যদিও এই ক্ষেত্রে আরও নানা প্রভাবকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে যেমন, শিক্ষার মান, সংস্কৃতি, ভাষা, দেশের অর্থনীতি ইত্যাদি, তথাপি স্কুল লেভেলে সাইকোলজিস্টদের সক্রিয়তা শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ, বিষন্নতা দূরীকরণ, মনোযোগ বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস অর্জন ইত্যাদি নানা ব্যাপারে অগ্রগতি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, Penn Resiliency Program for Children and Adolescent (PRP-CA) প্রোগ্রামটি স্কুল শিক্ষার্থীদের উপর কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি প্রয়োগ করে এবং এতে শিক্ষার্থীদের ডিপ্রেশন লেভেল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। এছাড়াও নেয়া যায় FRIENDS, জার্মানির JES Youth Prevention Program ইত্যাদি নানা প্রজেক্টের নাম যারা স্কুল সাইকোলজি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছে।

স্কুল লেভেলে পারদর্শী মনোবিজ্ঞানী এবং কাউন্সিলর শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী স্টাডি ডেভেলপমেন্ট ট্র্যাকিং, তাদের নানা দক্ষতা অর্জনে সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া, মানসিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেন। এছাড়াও তারা নানা সাইকোএজুকেশনাল টেস্ট এবং গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাথে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মাঝে সেতুবন্ধন গড়তে সহায়তা করতে পারেন। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও দূরত্ব বেশ বেড়ে চলেছে।

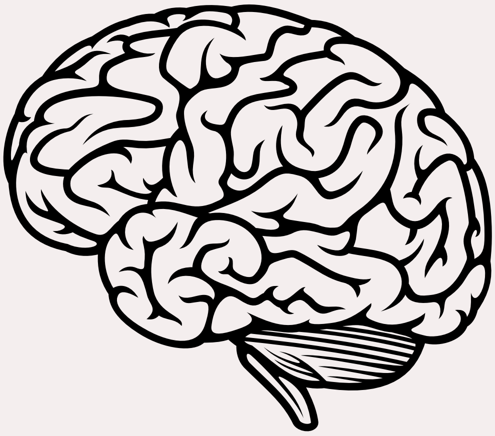

দেশ অর্থনৈতিকভাবে যত এগিয়ে যাচ্ছে, পরিবারে সন্তানেরা মা বাবার সান্নিধ্য পাচ্ছে বেশ কম। এছাড়াও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদিতে আসক্ত হচ্ছে বেশি। এতে শিক্ষার্থীদের মানসিক অশান্তি, অপরাধবোধ জীবন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে হতাশায় ঘেরা একটা বিরাট জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে কাজে উজ্জীবিত করতে এবং রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত মনোবিজ্ঞানী এবং কাউন্সিলর নিয়োগ দেয়া সময়ের অন্যতম দাবী। পাশাপাশি দেশে মনোরোগ, মনোবিজ্ঞান নিয়ে মানুষের সচেতনার ঘাটতি পূরণের রয়েছে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা।

“

প্রয়োজন রয়েছে মনোরোগ নিয়ে দেশের মানুষের মাঝে বিদ্যমান ট্যাবুগুলোর নিরসনের ব্যবস্থার।

প্রয়োজন রয়েছে মনোরোগ নিয়ে দেশের মানুষের মাঝে বিদ্যমান ট্যাবুগুলোর নিরসনের ব্যবস্থার। যেখানে ইউনেস্কো এডুকেশন ফ্রেমওয়ার্কে একটি দেশের জিডিপির ৪-৬ শতাংশ ও মোট বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার উচিৎ বলা হয়েছে, আমাদের দেশের জিডিপির মাত্র ২.০৯ শতাংশ এবং মোট বাজেটের মাত্র ১১.৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয় যা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষা খাতে ব্যয় আরও বাড়ানো আবশ্যক এবং এর পাশাপাশি বিদ্যালয় পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানীদের পদ সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এটিকে হাজার কোটি টাকা ব্যয় মনে হলেও লং টার্মে এটি যে সুফল বয়ে আনবে তা অবশ্যই ভাবনার বিষয় হওয়া উচিৎ। নতুবা কাগজে কলমে দেশ যতই এগিয়ে যাক না কেন, ভবিষ্যতে এটি হতাশা তৈরীর কারখানাতে পরিণত হবে!

লেখনীতে:
আরাফাত জুয়েল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রথম বর্ষ।

বিজ্ঞানের জগৎজুড়ে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে নানা চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার বা ঘটনাবলী, পুরস্কার পাচ্ছে অনেকেই। কেবলমাত্র বিজ্ঞানজগতের সকল আপডেটকে একত্র করতে আমাদের প্রতি সংখ্যায় থাকছে "বিজ্ঞান বুলেটিন", যার জন্য কাজ করে চলে হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের সদস্যরা। বিজ্ঞানজগতের সাথে আপডেটেড থাকতে প্রতি দুইমাসে একবার করে এই পাতায় আসে চোখ বুলিয়ে নিতেই পারো তুমি। আর যদি তুমি নিজেও এই বিজ্ঞান বুলেটিন টিমের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে চাও, তাহলে তোমার এই আগ্রহের কথা আমাদেরকে ইমেইল করে জানাও আমাদের মেইলে। আমাদের ম্যাগাজিনের জন্য অফিশিয়াল মেইল আইডিতে তোমার নাম, পরিচয়, পূর্ব অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), ইচ্ছার কারণ, এবং তোমার প্রতি মাসে ফ্রি সময়ের পরিমাণ জানাও।

আমাদের ইমেইল ঠিকানাঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com

নাসা প্রথমবারের মতো মঙ্গল গ্রহে এই জৈব অণুগুলি খুঁজে পেয়েছে!

নভেম্বর ১

NASA এর কিউরিওসিটি রোভার মঙ্গল গ্রহের শিলাগুলিতে সংরক্ষিত নতুন জৈব অণু খুঁজে পেয়েছে যা জীবের বসবাস উপযোগী। পৃষ্ঠের কাছাকাছি তিন বিলিয়ন বছরের পুরানো পাললিক শিলাগুলির "কঠিন" জৈব অণু, সেইসাথে বায়ুমণ্ডলে মিথেনের স্তরের ঋতুগত তারতম্য লক্ষ করেছে রোভার।
মঙ্গলগ্রহের মাটিতে জৈব উপাদান শনাক্ত করতে, কিউরিওসিটি "গেল ক্রেটারের" চারটি এলাকা থেকে কাদা পাথর নামে পরিচিত পাললিক শিলাগুলিতে ছিদ্র করে। প্রাচীন হ্রদের তলদেশে জমে থাকা পলি থেকে কোটি কোটি বছর আগে এই মাটির পাথর ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল। পাথরের নমুনাগুলি SAM দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, যা নমুনাগুলিকে (900 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা 500 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি) গুঁড়ো শিলা থেকে জৈব অণু মুক্ত করার জন্য একটি চুলা ব্যবহার করে। এই টুকরোগুলির মধ্যে কয়েকটিতে সালফার রয়েছে, যা গাড়ির টায়ারকে আরও টেকসই করবে। ফলাফল হতে দেখা যায় , জৈব অণুগুলো কার্বন দ্বারা গঠিত চিহ্নিত কিছু অণুর মধ্যে রয়েছে থিওফেন, বেনজিন, টলুইন এবং ছোট কার্বন চেইন, যেমন প্রোপেন বা বিউটিন।

তথ্যসূত্রঃ ইনভার্স

”

কিউরিওসিটি "গেল ক্রেটারের" চারটি এলাকা থেকে কাদা পাথর নামে পরিচিত পাললিক শিলাগুলিতে ছিদ্র করে।

|| কিউরিওসিটি রোভার

মহাবিশ্বে পাওয়া গেছে পানির সন্ধান!

নভেম্বর ৬

আমাদের সৌরজগতের বাইরে পাওয়া গিয়েছে পানির অস্তিত্ব। চিলিতে অবস্থিত অ্যাটাকামা লার্জ মিলিমিটার/সাব মিলিমিটার অ্যারে (ALMA) টেলিস্কোপ ব্যবহার করে, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই প্রাচীন ছায়াপথে জলের অণু শনাক্ত করেছেন। SPT0311-58 নামের এই গ্যালাক্সিতে পানির সন্ধান পাওয়া গেছে। এটাই আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে সবচেয়ে দূরের পানির প্রমাণ। SPT0311-58 গ্যালাক্সির যে স্থানে পানির অণুগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তা দুটি ছায়াপথ নিয়ে গঠিত। গ্যালাক্সি থেকে আসা আলো থেকে মনে হচ্ছে দুটি মহাবিশ্ব সেখানে মিলিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্রঃ নিউজএনসিআর

পরমাণু এবং নিউট্রন নক্ষত্রের মৌলিক পদার্থবিদ্যা অনুসন্ধান করতে মিরর নিউক্লিয়াসের ব্যবহার।

নভেম্বর ৬

প্রায় 20 বছর আগে, একজন পদার্থবিজ্ঞানী মহাবিশ্বের কিছু চরম পরিবেশে কাজ করে এমন একটি মৌলিক কিন্তু রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করার একটি ধারণা করেছিলেন। এই পরিবেশগুলির মধ্যে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস এবং নিউট্রন তারা নামে পরিচিত। উভয়ই মানবতার কাছে পরিচিত সবচেয়ে ঘন বস্তুর মধ্যে রয়েছে। তুলনা করার জন্য, একটি নিউট্রন নক্ষত্রের ঘনত্বের সাথে মেলানোর জন্য পৃথিবীর সমস্ত ভরকে স্টেডিয়ামের আকারের মতো একটি স্থানের মধ্যে চাপতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

বৈষম্য তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।

নভেম্বর ৮

গবেষকরা 1, 834 আমেরিকানদের উপর এক দশকের মূল্যের স্বাস্থ্য

ডেটা পরীক্ষা করেছেন যাদের বয়স 18 থেকে 28 বছরের মধ্যে ছিল যখন গবেষণা শুরু হয়েছিল। তারা দেখেছে যে বৈষম্যের প্রভাবগুলি ক্রমবর্ধমান হতে পারে - যে যত বেশি সংখ্যক বৈষম্যের ঘটনা কেউ অনুভব করে, মানসিক এবং আচরণগত সমস্যার জন্য তাদের ঝুঁকি তত বেশি বৃদ্ধি পায়।

সমীক্ষাটি আরও পরামর্শ দেয় যে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বৈষম্যের প্রভাব মানসিক স্বাস্থ্য উদ্বেগের যত্নের বৈষম্যের সাথে যুক্ত এবং সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের সাথে জড়িত , যার মধ্যে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের ফলাফলের বৈষম্য রয়েছে। গবেষণাটি ৮ নভেম্বর ২০২১ পেডিয়াট্রিক্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র: মেডিকেল এক্সপ্রেস

নভেম্বর ১০

পিরামিডের মতো ডিএনএ সহ নতুন-সূচনা টাইপ 1 ডায়াবেটিস বিপরীত করা: মাউস স্টাডি!

সাধারণত শিশু, কিশোর এবং অল্প বয়স্কদের মধ্যে নির্ণয় করা হয়, টাইপ 1 ডায়াবেটিস একটি অটোইমিউন রোগ যেখানে ইমিউন সিস্টেম অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন-নিঃসরণকারী বিটা-কোষকে আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে। ফলস্বরূপ, টাইপ 1 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং বেঁচে থাকার জন্য ইনসুলিন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এখন, গবেষকরা টেট্রাহেড্রাল ফ্রেমওয়ার্ক নিউক্লিক অ্যাসিড (tFNAs) নামক পিরামিড-সদৃশ ডিএনএ অণুর সাহায্যে ইঁদুরের নতুন-সূচনা টাইপ 1 ডায়াবেটিসকে বিপরীত তথা রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তথ্যসূত্র: সায়েন্স ডেইলি

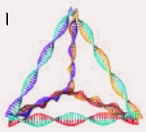
পিরামিড সদৃশ ডিএনএ

নভেম্বর ২২

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে রক্ত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা!

সারা বিশ্বের সাইটোলজিস্টরা হাজার হাজার বার অস্থি মজ্জা কোষের নমুনা বিশ্লেষণ এবং শ্রেণিবদ্ধ করতে অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে। 150 বছরেরও বেশি আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও রক্তের রোগ নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটি খুবই জটিল। বিরল কিন্তু ডায়াগনস্টিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোষ খোঁজা উভয়ই একটি শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। সম্প্রতি একটি গবেষণা দল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য মাইক্রোস্কোপের অধীনে অস্থিমজ্জা কোষগুলির সময়সাপেক্ষ বিশ্লেষণকে সহজতর করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই পদ্ধতিটি বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে -- তবে একটি AI অ্যালগরিদম প্রশিক্ষণের জন্য এটির জন্য প্রচুর পরিমাণে উচ্চমানের ডেটা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র: সায়েন্স ডেইলি

নভেম্বর ২৩

রোগের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির ব্যবহার।

বিজ্ঞানের কাছে একটি একক কোষের মধ্যে প্রতিটি জিনের কার্যকলাপ পরিমাপ করার প্রযুক্তি রয়েছে।

বর্তমানে প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি একক কোষের মধ্যে প্রতিটি জিনের কার্যকলাপ পরিমাপ করা সম্ভব। শুধুমাত্র একটি পরীক্ষা হাজার হাজার কোষের ডেটা তৈরি করতে পারে। সম্প্রতি সুইডেনের লান্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা 3D ভিডিও গেমিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ডেটা বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। গবেষণাটি আইসায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: সায়েন্স ডেইলি

নভেম্বর ২৪

বাদামী বামন গ্রহ REID-1B এ অক্ষতভাবে লিথিয়ামের আবিষ্কার।

মেক্সিকোর Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) এবং The Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) এর একটি গবেষক দল প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে ঠাণ্ডা বাদামী বামন গ্রহে লিথিয়াম আবিষ্কার করেছেন। এখন পর্যন্ত গ্রহটিতে এই মূল্যবান উপাদানটির উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। আমাদের মহাজাগতিক প্রাচীনতম লিথিয়াম Reid 1B নামক এই উপ-নাক্ষত্রিক বস্তুটিতে অক্ষতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। The Roque de los Muchachos Observatory (Garafía, La Palma) তে অবস্থিত Gran Telescopio Canarias (GTC) এর OSIRIS spectrograph ব্যবহার করে এটি আবিষ্কৃত

তথ্যসূত্র: সায়েন্স ডেইলি

নভেম্বর ২৪

ইনসমনিয়া ও বিষণ্ণতা রোধে Cognitive Behavioural Therapy-I

UCLA Health এর গবেষকদের নেতৃত্বে একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে cognitive behavioral therapy (CBT-I) বড় ধরনের বিষণ্ণতা রোধ করে। ৬০ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এটি অনিদ্রার সম্ভাবনা ৫০% এর বেশি হ্রাস করে। তাই CBT-I নিদ্রাহীন ব্যক্তিদের জন্য প্রথম লাইনের চিকিৎসা হিসেবে সুপারিশ করা হয়। অনিদ্রা সহ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বড় বিষণ্ণতা প্রতিরোধে CBT-I নিশ্চিত হতে বেশ কিছু পরীক্ষা করা হয় যার ফলাফল দেখায় যে CBT-I এর মাধ্যম চিকিৎসা অনিদ্রায় ভোগা প্রাপ্তবয়স্কদের বড় ধরনের বিষণ্ণতাজনিত রোগ প্রতিরোধে সুবিধা প্রদান করে।

তথ্যসূত্র: সায়েন্স ডেইলি

ফোটনের শক্তি রূপান্তর-কারী পদার্থ তৈরিতে সাফল্য!

নভেম্বর ২৭

আমরা জানি আলো ফোটন দিয়ে তৈরি এবং প্রতিটি ফোটনের শক্তির মান, ঐ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালনা, তড়িৎযন্ত্র তৈরিসহ আরও বিভিন্ন কাজে আলো ব্যবহার করা হয়। এসকল কাজে সকল প্রকার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ সৌরকোষের মতো যন্ত্রগুলোতে সূর্যের আলোর সকল রং বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো এসে পড়ে এবং এই আলোতে উচ্চ এবং নিম্ন উভয়প্রকার শক্তির ফোটন থাকে। কিন্তু অধিকাংশ কাজের জন্যেই নির্দিষ্ট শক্তির ফোটন প্রয়োজন হয়। এ কারণে বিজ্ঞানীরা এমন বস্তুর সন্ধানে ছিলেন যা নিম্ন শক্তির ফোটনকে উচ্চ শক্তির ফোটনে রূপান্তরিত করবে। সম্প্রতি জাপানের টোকিও টেক-এর করা একটি গবেষণায় এমন বস্তুর সন্ধান মিলেছে। ভ্যানডার ওয়ালস বল দিয়ে তৈরি এই স্ফটিকসমূহ ফোটন কণার শক্তি পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। স্ফটিকসমূহ তৈরি হয় হাইড্রোকার্বন দিয়ে। ধারণা করা হচ্ছে, এই আবিষ্কার আলোকশক্তি-নির্ভর যন্ত্রপাতি তৈরিতে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

LEO 1

ডিসেম্বর ১

মহাবিশ্বের অন্ত জানা নেই, তাই সীমা নেই একে নতুন করে জানারও। সম্প্রতি University of Texas এর Austin's McDonald Observatory এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানান দিয়েছেন এক বিশাল ব্ল্যাক হোলের ব্যাপারে। আমাদের এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মধ্যেই, LEO 1 নামক spheroidal, সাদা বামন স্যাটেলাইট গ্যালাক্সির (White dwarf satellite galaxy) কেন্দ্রে। এটি আমাদের থেকে 820 হাজার আলোকবর্ষ দূরে এবং 30 গুণ ছোট মিল্কিওয়ে থেকে। পূর্বে এই স্যাটেলাইট গ্যালাক্সির বেগ নিয়ে গবেষণা করা হলেও এইবার ভিন্ন কিছু চোখে পরে বিজ্ঞানীদের।

Maria Jose Bustamante এর পরিচালনায় Eva Noyola, Karl Gebhardt এবং Greg Zeimann এর টিম VIRUS-W on McDonald Observatory's 2.7-meter Harlan J. Smith Telescope দিয়ে পরীক্ষা করে এই গ্যালাক্সিকে। তারা দেখে যে, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অন্য সব Dwarf গ্যালাক্সি থেকে LEO 1 এর ডার্ক ম্যাটারের মাত্রা কম। Darkmatter Profile দেখে বিজ্ঞানীরা জানান যে এর ডার্ক ম্যাটারের ঘনত্ব এর কেন্দ্রের দিকে যেতে যেতে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। মনে হয় যেন বিশাল 'মহাকর্ষীয় কোনো আকর্ষণ ' টানছে। সব ধরনের তথ্য টিমটি যোগাড় করে UT Austin's Texas Advanced Computing Center এর সুপারকম্পিউটারে প্রদান করে। আর এই হিসাব নিকাশ বলে দেয় LEO 1 এর কেন্দ্রে কেবল বিশাল এক BLACKHOLE থাকলেই এমনটা সম্ভব।
এমনকি এই ব্ল্যাকহোলের ভরের ধারণা করা হচ্ছে Sagatarius A নামক সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের সাথে। এটাই সবথেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কেননা এতো ছোট জায়গায় এতো ভর কমা রয়েছে কিভাবে? এর অনুসন্ধানও চলছে।

তথ্যসূত্র: University of Texas at Austin, The Astronomical Journal, science daily, youtube

কোভিড পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাব্যবস্থার দায়িত্ব পালনে রোবট।

ডিসেম্বর ২

কোভিড উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগেই প্রমাণিত হয়েছে যে অন্তত ২-৩ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে মানুষের চলাফেরা করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তা লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। তাই নতুন ধারার কৃত্রিম বুদ্ধিমতার বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির Adarsh Jagan Sathyamoorthy জানান দিয়েছেন যে তাদের গবেষণার চলনশীল রোবটগুলো সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার উপদেশ দিতেও সক্ষম।

এই ধরনের রোবট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায়ের নিয়ম লঙ্ঘন খুঁজে বের করে তার RGB-D (Red Green Blue-Depth) ক্যামেরা এবং 2-D LiDAR (Light Detection & Ranging) সেন্সর। এতে থার্মাল ডিটেক্টরও রয়েছে যা দেহের তাপমাত্রার প্রতি সতর্ক থাকে। এই ধরনের রোবট তার শরীরে অবস্থিত স্ক্রিনের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ সতর্ক বার্তাও জানান দিতে পারে লোকজনদের। তাছাড়া এটি যেকোনো এলাকার সিসিটিভির সাথে একাত্ম হয়ে বিশাল পরিসরেও কাজ করতে সক্ষম। কর্তৃপক্ষ জানায় এই সিস্টেমে মূলত মেশিন লার্নিংয়ের Deep Re-inforcement Learning (DRL) এবং Frozone অ্যালগরিদম ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল এই ক্ষেত্রেই নয়, এই সিস্টেমটি হসপিটালাইজিংয়েও অবদান রাখতে পারে। ফলে অনেক সুরক্ষাকর্মীদের আশার বার্তা হতে পারে এই রোবট।

তথ্যসূত্র: PLOS ONE, SCIENCE DAILY

> এই ধরনের রোবট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায়ের নিয়ম লঙ্ঘন খুঁজে বের করে তার RGB-D (Red Green Blue-Depth) ক্যামেরা এবং 2-D LiDAR (Light Detection & Ranging) সেন্সর।

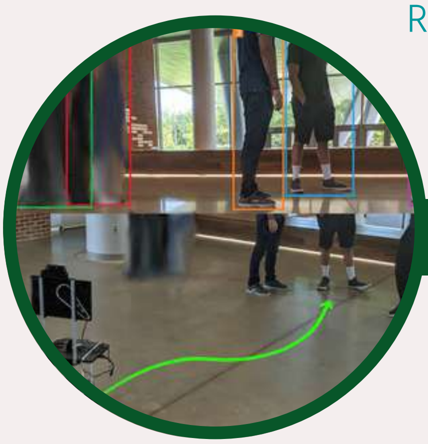

|| নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব পালনে রোবট

জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে একক লিঙ্গ ইঁদুরের লিটার তৈরি।

ডিসেম্বর ৩

ইউনিভার্সিটি অফ কেন্টের সহযোগিতায় ফ্রান্সিস ক্রিক ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা 100% দক্ষতার সাথে শুধুমাত্র মহিলা এবং শুধুমাত্র পুরুষ ইঁদুরের লিটার তৈরি করতে জিন এডিটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন।

গবেষক-দল নতুন পদ্ধতিটিতে নিষিক্ত-করণের পর শীঘ্রই ভ্রূণকে নিষ্ক্রিয় করতে একটি দুই-অংশের জেনেটিক সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। যার মাধ্যমে শুধুমাত্র যেকোনো একটি লিঙ্গের বিকাশ ঘটানো যায়। বংশের লিঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই ধরনের একটি জেনেটিক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং কৃষিকাজ উভয় শিল্পের ক্ষতি কমাতে পারে।

তথ্যসূত্র: সায়েন্স ডেইলি।

জলাভূমিতে মিথেন নির্গমনের সবচেয়ে বড় পথ হলো গাছ!

ডিসেম্বর ৫

সাধারণত গাছ কার্বন ডাই অক্সাইডের পাশাপাশি অনেক বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করে। কিন্তু University of Birmingham এর একদল গবেষক জানিয়েছেন ভিন্ন কথা। আমাজন জলাভূমি অঞ্চল থেকে নির্গত মিথেন গ্যাসের বেশিরভাগই গাছের মূলের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এমনকি ভূমি পানিতে প্লাবিত না হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মিথেন নিঃসরণ ঘটে।

রয়েল সোসাইটি জার্নালের Philosophical Transaction এ একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে যে, গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন মাটি বা পৃষ্ঠের জলের তুলনায় আমাজন অববাহিকায় প্লাবনভূমিতে বেড়ে ওঠা গাছ থেকে অনেক বেশি মিথেন নির্গত হয়। এটি ভেজা এবং শুষ্ক উভয় অবস্থায়ই ঘটে।

তথ্যসূত্র: সায়েন্স ডেইলি।

পরিযায়ী পাখিদের লম্বা দূরত্বে অতিক্রমে পালকের রঙের সূক্ষ্ম প্রভাব।

ডিসেম্বর ৬

গাড় রং হালকা রঙের তুলনায় অধিক সূর্যের আলো বা তাপ শোষণ করতে পারে, একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু পাখির পালকের রং-ও যে এই নীতি মেনে চলে তা জানা ছিল না। ছোট্ট হামিংবার্ড থেকে শুরু করে বিশালাকার হুপিং ক্রেইন পর্যন্ত পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি পাখি অভিবাসন বা ঋতুভেদে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। লম্বা ডানা এবং মাংসল পেশি পাখিদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করে। কিন্তু সম্প্রতি "কারেন্ট বায়োলজি"- প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে গবেষকেরা জানিয়েছেন, পরিযায়ী পাখিদের উড়ার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় প্রভাব ফেলে এবং তা হলো পাখির পালকের রং। হালকা রঙের পালক পাখিদের ঠাণ্ডা রাখে এবং গাড় রঙের পাখির পালক সূর্যের তাপ শোষণ করার ফলে, তাদের অধিক গরম অনুভূত হয়। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউট ফর অর্নিথোলজির পক্ষীবিদ কাসপার ডেলহেই এবং তার সহকর্মীরা ১০, ৬১৮ টি পাখির ২০, ০০০ এরও বেশি চিত্র বিশ্লেষণ করে এই তথ্য জানতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র: সায়েন্স নিউজ।

বরফ-পানি!

ডিসেম্বর ৬

আপনি কি জানেন পানিকে ঠাণ্ডা করতে থাকলে যখন তা শূন্য ডিগ্রিতে নামিয়ে আনা হয় তখন তা জমাট বাঁধতে শুরু করে? হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই তা জানেন। পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের সুবিধার্থে এটাও জানেন যে শূন্য ডিগ্রিতেই সব পানি বরফ হয়ে তারপর তার তাপমাত্রা হয়তো আরো কমে! এইবার কিন্তু আপনার জানাটা সঠিক নয়!

পানিকে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বরফ করে ফেলা যায় নাহ। পানিকে বিন্দুরূপে ঠাণ্ডা করা হলে দেখা যায়, পানির মাইক্রন লেভেলের কণাকে জমাট বরফ করতে 'সুপার-কুলড' দশার (০° সে.এর নিচে) প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা যায় ০° সে. থেকে -৩৮° সে. তাপমাত্রার মধ্যে যে কোনো পানি বা পানির বিন্দু বরফে পরিণত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে University of Houston এর অধ্যাপক প্রফেসর Hadi Ghasemi এর গবেষণা থেকে জানা যায় - "যদি পানির বিন্দুকে নরম কোনো ইন্টারফেসের সংস্পর্শে রাখা হয় এবং পানির বিন্দু যদি মাইক্রন বা ন্যানো লেভেলের হয় (এক্ষেত্রে 2 ন্যানোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট পানির বিন্দু) তবে তার বরফ হতে -৩৮°সে. কেও টপকে যায় এমনকি -৪৪°সে. এরও উপরে উঠে যেতে পারে।"

অর্থাৎ, এতদিন ধরে যে লিমিট (০° থেকে -৩৮°) ধারণা করা হচ্ছিলো তার বাঁধ ভেঙে গেলো। কেবল এখানেই ক্ষান্ত নয়। তার এই গবেষণার ভিত্তিতে তীব্র ঠাণ্ডায় কোষের পরিস্থিতিও গবেষণার একটি অংশ হয়ে উঠবে নতুনভাবে!

তথ্যসূত্র: University of Houston, Science Daily

বিশ্বের প্রথম অপটিক্যাল অসিলোস্কোপ আবিষ্কার।

ডিসেম্বর ১৩

University of Central Florida (UCF)-র একটি টিম প্রথমবারের মতো অপটিক্যাল অসিলোস্কোপ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি এমন একটি যন্ত্র, যা আলোর তড়িৎক্ষেত্র পরিমাপ করতে পারে। যন্ত্রটি আলোক তরঙ্গকে তড়িৎ সংকেতে পরিণত করে। আলোর দ্রুতগতির কারণে ফাইবার অপটিক যোগাযোগ ব্যবস্থার গতিও দ্রুত। এক্ষেত্রে পুরো কার্যক্রমটি অসিলোস্কোপ-এর গতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি অসিলোস্কোপ এর পরিবর্তে অপটিক্যাল অসিলোস্কোপ ব্যবহার করা হয়, তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থার গতি আরো অনেকগুণ বেড়ে যাবে। এমনটি জানিয়েছেন UCF এর গবেষক প্রফেসর Michael Chini। টিমটির গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে নেচার ফটোনিকস জার্নালে।

তথ্যসূত্র: সাইটেক ডেইলি

ডিসেম্বর ১৪

লকডাউন ঘটিয়েছে “OPIOID পেইনকিলার মহামারীর” অপব্যবহারের প্রসার।

Opioid মহামারী হল প্রেসক্রিপশন opioid প্রতি আসক্তিজনিত রোগের একটি ব্যাপক ঘটনা। ব্যথা বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে opioid গ্রহণকারী ব্যক্তিরা প্রায়ই প্রেসক্রিপশন opioid প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং আসক্তির বশে opioid তিন থেকে চার সপ্তাহের বেশি সময় ধরেও খাওয়া হয়। ওপিওডের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী ব্যাথায় ভোগেন এবং opioid পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হন। একটি নতুন গবেষণায় বলা হয়েছে, মহামারী লকডাউনের কারণে গত বছর যেসব আমেরিকানরা ব্যথার চিকিৎসা নিতে গিয়ে সাহায্য চেয়েছিল তাদের বিপজ্জনক opioid ব্যথানাশক গ্রহণের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল।

তথ্যসূত্র: মেডিসিন নেট

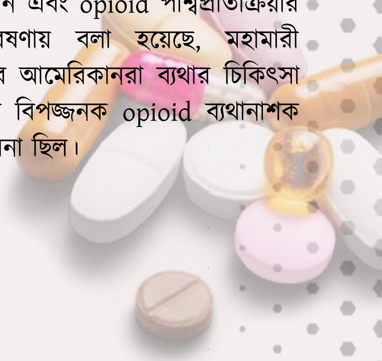

সবচেয়ে ছোট সাই-ফাই গল্প

নক

ফ্রেডরিক ব্রাউন

"পৃথিবীর সর্বশেষ মানুষটি একা রুমটিতে বসে ছিল। হঠাৎ, দরজায় কে যেন নক করলো।"

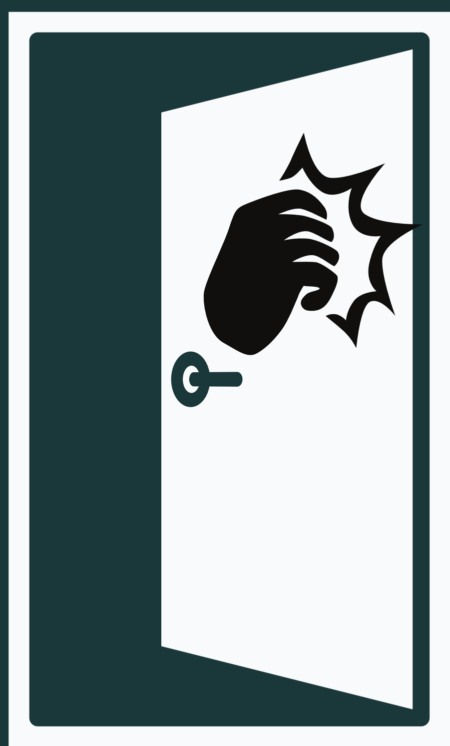

মাল্টিভার্স!

– আদৌ কি **সম্ভব!**

"What do you know about **Multiverse?**"
-(Doctor Strange)

সায়েন্স ফিকশন কিংবা থ্রিলার ঘরানার ছবিতে এখন যে বিষয়টি প্রায়ই দেখা যায় সেটা হলো "মাল্টিভার্স"। মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের স্ট্রেঞ্জের কাছ থেকেই মাল্টিভার্সের অবাক করা ভ্রমণ দেখা যায়।

ছোটবেলায় ডোরেমনের Anyway door দিয়ে সব জায়গায় স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু স্ট্রেঞ্জ দেখি তার বারো হাত এগিয়ে! মহাবিশ্ব থেকে মহাবিশ্বে লাফ। আদৌ একি কখনো সম্ভব?
কিন্তু জানেন কি, বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকুর মতে যে তিনটি শ্রেণীর অসম্ভব জিনিস আছে তার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মাল্টিভার্স। দ্বিতীয় সারির অসম্ভব বলতে বোঝায় এরা আমাদের বোধের মধ্যে আসতে হয়তো আরো কয়েক মিলিয়ন সময়ও লাগতে পারে, কিন্তু উড়িয়ে দেয়া যায় না একেবারেই। আমরা সচরাচর প্যারালাল ইউনিভার্স এর নাম শুনে থাকি এবং মনে হয় যে - ঠিক একই রকম "আরেকটি" ইউনিভার্স আছে যাতে সব হয়তো আমার মনের ইচ্ছে মতো হয়। আসলে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেবল একটি কেন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ইউনিভার্স থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে তার আগে জেনে নেয়া যাক প্যারালাল ইউনিভার্সকে যে ০৩ টি ভাবে দেখা যেতে পারে।

- হাইপারস্পেস বা হাইয়ার ডাইমেনশন
- দ্যা মাল্টিভার্স
- কোয়ান্টাম প্যারালাল ইউনিভার্স

মাল্টিভার্সের জগতে যাওয়ার আগে আমরা স্ট্রিং থিওরি সম্পর্কিত কিছু তথ্য জেনে নি। আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বৃহৎ পরিসরের জিনিস যেমন-গ্যালাক্সি, ব্ল্যাকহোল, গ্রহ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে আইন্সটাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আর অতি ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। বিজ্ঞানের সব ধর্মকেই এই দুইটি দ্বারা মোটামুটি ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন একটি মাত্র থিওরি দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে, তারা তালাশ করেছে GUT(Grand Unification Theory) বা থিওরি অব এভরিথিং (Theory Of Everything)। ঠিক এই জায়গায় এসে আমাদের পরিচয় ঘটে স্ট্রিং থিওরির সাথে। স্ট্রিং থিওরি বা সুপারস্ট্রিং থিওরির মূল ভাষ্য হলো আমাদের চারপাশের সব কিছুই এই স্ট্রিং দিয়ে তৈরি বা লেপটন, কোয়ার্ক, মেসন ইত্যাদি হলো স্ট্রিংগুলোর নিম্নস্তরের কম্পন; অনেকটা টানটান করা রাবারে টোকা দিলে যেরকম বিভিন্ন মাত্রার কম্পন তৈরি হয় তেমন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় কখন এই স্ট্রিংগুলো কম্পিত হয় তা নিয়ে। গাণিতিক ভাবে দেখা যায় এই স্ট্রিংগুলো কেবল "দশ মাত্রার স্পেস-টাইম ডাইমেনশনে" (10D) কম্পিত হতে পারে, যেখানে আমাদের দৃশ্যমান সব কিছু চার মাত্রার (4D - তিন মাত্রার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং চতুর্থ মাত্রার সময়)। তাই আমাদের পক্ষে তা পর্যবেক্ষণ করা আপাদত সম্ভব নয়। এই স্ট্রিং থিওরি নির্ণয়ের মূল লক্ষ্য হলো কোয়ান্টাম থিওরি এবং আপেক্ষিকতার থিওরিকে একত্রিত করা।
দশম মাত্রাতে স্ট্রিং থিওরি -কোয়ান্টাম এবং আপেক্ষিকতার বা গ্র্যাভিটেশনাল থিওরিকে একত্রিত করা সম্ভব। কিন্তু তা করা যায় ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ ভাবে। যার মানে দশম মাত্রায় আমরা পাঁচটা ভিন্ন থিওরি পাবো যারা স্ট্রিং থিওরিকে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু আমরা খুঁজছিলাম একটি মাত্র থিওরি যার মাধ্যমে পুরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাবে। ১৯৯৪ সালে এই সমস্যার সমাধান নিয়ে বিজ্ঞান মহলে হইচই

ফেলে দেন Edward Witten। তিনি বলেন এই পাঁচটি থিওরি মূলত একটি থিওরিরই অন্তর্গত যদি আমরা একটা নতুন ডাইমেনশন, 11 th ডাইমেনশন কল্পনা করে নি। বিষয়টি এভাবে দেখা যায়, যদি আমরা দোতলার "উপর", তিন ডাইমেনশন থেকে 'জুয়েল' ভাইকে দেখি তবে আমরা কেবল তার মাথা দেখবো যা দুই ডাইমেনশনের আর যখন তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখবো তখন তাকে সম্পূর্ণটাই দেখবো। একই ভাবে কেউ যদি 11 ডাইমেনশনে দাঁড়িয়ে 10 ডাইমেনশনে দেখে তবে সে স্ট্রিং থিওরিকে পাঁচ ভাগে দেখবে, কিন্তু 11 ডাইমেনশনে সেই পাঁচটি স্ট্রিং থিওরিকে একটিই মনে হবে। অর্থাৎ আমরা একটি এবং কেবল একটি থিওরিই পাবো যা আমরা চাচ্ছিলাম।

এই 11D(dimension) স্পেস-টাইমে এক ধরনের জ্যামিতিক বস্তু থাকা সম্ভব যাকে মেমব্রেন বা সুপার মেমব্রেন (super membrane) বলা হয় (অনেকটা গোলকের পৃষ্ঠের মত)। আগেই বলেছি কোনো কিছু একাদশ মাত্রা থেকে দশম মাত্রায় গেলে পাঁচটি স্ট্রিং থিওরির আবির্ভাব ঘটে, অর্থাৎ এই পাঁচটি স্ট্রিং থিওরি আদতে পাঁচটি "রকম" , যেভাবে একাদশ মাত্রার মেমব্রেন থেকে দশম মাত্রার মেমব্রেনে যাওয়া যায়। এই ডাইমেনশনগুলো যে কেবল ক্ষুদ্র হতেই হবে তা কিন্তু নয়, এমনও হতে পারে এই ইউনিভার্সটা একটি মেমব্রেন এবং আমরা 11D স্পেসটাইমে ভাসছি। ঠিক এই ভাবনাটায় আমাদেরকে মাল্টিভার্সের কাছে নিয়ে যায়। কেননা 11D এ এরকম হাজারো কোটি মেমব্রেন থাকা সম্ভব এবং তারা হয়তো ধারন করে থাকবে এরকম হাজারো-কোটি ইউনিভার্স। এই

মেমব্রেনকে সাবানের বুদবুদের (bubble) সাথে তুলনা করা যায়, যেখানে অনেকগুলো সাবানের বুদবুদ ভাসছে। তাদের কেউ কেউ হঠাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার কোনো কোনোটা একটা আরেকটার সাথে ধাক্কা লেগে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে বলা হয় এরকম প্রায় 1 গুগল (10100 টি) ইউনিভার্স থাকাও সম্ভব। 10D এবং 11D এ কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং গ্র্যাভিটি অবশ্যই কাজ করে (করে বলেই তো স্ট্রিংথিওরি এসেছে)। একজন মানুষের পক্ষে এক মাত্রা থেকে আরেক মাত্রায় যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু গ্র্যাভিটি তো যেতে পারে! কেননা প্রতিটি স্পেস-টাইম মাত্রার সাথেই গ্র্যাভিটি রয়েছে। তবে আলো কিন্তু যাতায়াত করতে পারে নাহ কারণ এটি ফোটনের তৈরি, এমনকি আমাদের 4D ইউনিভার্স ছাড়া অন্য মাত্রায় আলো ভিন্ন বেগেও চলতে পারে। গ্র্যাভিটির বিষয়টি নিয়ে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, আমরা যে ডার্ক ম্যাটার নিয়ে বর্তমানে বড্ড ব্যাস্ত ; হয়তো এই ডার্ক ম্যাটার অন্য একটি ইউনিভার্সের সাধারণ বস্তু। কেননা গ্র্যাভিটি তো এক মাত্রা থেকে অন্য মাত্রায় যেতে পারে ফলে অন্য মাত্রার ভর হয়তো আমাদের মাত্রায় ডার্ক ম্যাটারর হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এগুলো কেবল সম্ভাবনার কথা।

মূলত ক্ষুদ্র কণিকা এবং বৃহৎ গ্রহদের চলন একসাথে করার জন্য যে স্ট্রিং থিওরির পথে আমরা চলেছি তা প্রতিনিয়ত আমাদের দিয়ে চলেছে হতবাক করা নানা তথ্য।

এখন দেখার বাকি - বিজ্ঞান কি আমাদের এমন বুদ্ধিও দিয়ে দেবে, যাতে ডক্টর স্ট্রেঞ্জের মতো আমরাও একটা ফায়ারওয়ার্ক তৈরি করে ফুশ করে অন্য মাত্রায় চলে যেতে পারি?

সোর্স: মিডিয়া ডট কম, ফিজিক্স অভ দ্যা ইম্পসিবল

লেখনীতে:

এনামুল হক জুয়েল
চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

আপনি কি জানেন?

সমুদ্রের তলানিতে লুকিয়ে আছে কী?

মহাসমুদ্রের শতকরা ৯৫ শতাংশ এখনো আমাদের আবিষ্কারের অন্তরালে। তবে সেখানে কী রয়েছে ? উত্তরের খোঁজে ১৯৬০ সালে ডন ওয়ালশ ও জ্যাকেস পিকার্ড ডুব দেন পানিস্তরের সাত মাইল গভীরে। মানব কৌতুহলের শিখরে পৌঁছেও সমুদ্রজীবনের কেবল একটি ছোট্ট অংশ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয় তাদের। মহাসমুদ্রের তলদেশ ভ্রমণ বেশ কঠিন, তাই বেশিরভাগ সময় মানবহীন যন্ত্রপাতির মাধ্যমেই গবেষকরা পর্যালোচনা করে থাকেন। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৫% অংশে আমরা খুঁজে পেয়েছি মধ্য-সামুদ্রিক শৈলশিরা, জলবিদ্যুৎ ভেন্ট, কাদা আগ্নেয়গিরি, সমুদ্র পর্বত এবং গিরিখাত, বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদি। বিশেষত বেরিলেয়ে নামক একটি অদ্ভুত মাছ সম্প্রতি এসেছে আলোচনায়, যেটি দেখতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। মাছটির ক্রাস্টেসিয়ান থেকে তৈরি হয়েছে আলঝেইমার এর প্রতিষেধক। সামুদ্রিক এমন অনেক বৈচিত্র্য এখনো ঢেকে আছে তরঙ্গের আড়ালে, উদ্ধারের বেশ বাকি!

কি, কেন ও কিভাবে!

ম্যাগাজিনের এই অংশে থাকছে তোমাদের বেশ কিছু প্রশ্নের জবাবে আমাদের এক্সপার্ট প্যানেল এর উত্তরসমূহ। কী কী ধরণের প্রশ্ন হতে পারে, তার কিন্তু শেষ নেই। তোমাদের কিশোরমনে যতরকম বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে ইচ্ছা জাগ্রত হবে, তার সবরকমের প্রশ্নেরই উত্তর থাকবে। আর যদি তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেখতে চাও ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে, তাহলে এখনই ই-মেইল করে তোমার প্রশ্ন পাঠিয়ে দাও!

(ই-মেইল এর ঠিকানা: whiteorigins.wbsc@gmail.com, মেইলে নাম, শ্রেণী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখবে)

চলো দেখে নেওয়া যাক তোমার মত কিশোর-কিশোরীরা কী প্রশ্ন করেছে এবং জেনে নেওয়া যাক উত্তরও!

১) মানুষ কোনো বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় কেন?

~সামিহা আফসারা ইবনাত
নবম শ্রেণি, সরকারি পি এন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তর: আসক্তি আমাদের মস্তিষ্কে তার শক্তিশালী প্রভাব বজায় রাখে। মূলত অনেক কিছুর কারণে বস্তুর প্রতি আমরা আসক্ত হতে পারি। অনেক ক্ষেত্রে হীনমন্যতা, বিষণ্ণতাও আসক্তি সৃষ্টি করতে পারে। আমরা যেই বস্তুর প্রতি আসক্ত, সেই বস্তু স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সেন্টারকে খুশি করতে পারে। অর্থাৎ, আমাদের মস্তিষ্কের nucleus accumbens থেকে ডোপামিন নিঃসরণ করে যা আমাদের মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট করে।

২) একাকীত্ব (loneliness), অন্তর্মুখিতা (introvert ness) ও shyness বা লাজুক অনুভব করা — পার্থক্য কোথায়?

-আদিত্য পাল
বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

উত্তর: ইন্ট্রোভার্ট হলো একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের মধ্যে অনেকে ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী। আবার অনেকেই এক্সট্রোভার্ট বা বহির্মুখী। লাজুক বা লজ্জা পাওয়া হয়তো কিছুটা স্বাভাবিক। নতুন পরিবেশে হয়তো আমরা এরকম বোধ করতে পারি। তবে এটি হীনমন্যতার কারণ হতে পারে যা ক্ষতিকর। আর একাকীত্ব বা একা একা থাকতে চাওয়া মানসিক সমস্যাও হতে পারে, আবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও হতে পারে। একাকীত্ব হীনমন্যতা, বিষণ্ণতা বা উদ্বিগ্নতার কারণ হতে পারে।

একাকীত্ব, হীনমন্যতা, বিষণ্ণতা বা উদ্বিগ্নতার কারণ হতে পারে।

৩) লুসিড ড্রিম কি rare?

দেবজিৎ দত্ত,
চট্টগ্রাম সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়।

উত্তর: হ্যাঁ, বলা যায় লুসিড ড্রিম প্রায় রেয়ার। লুসিড ড্রিম এর ক্ষেত্রে ড্রিমার বা যিনি স্বপ্ন দেখছেন, তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি স্বপ্ন দেখছেন ও চাইলে তিনি ওই স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন! এটি সাধারণত REM (Rapid eye movement) পর্যায়ে ঘটে। এই লুসিড ড্রিম এর উপকারিতা রয়েছে যেমন - দুঃস্বপ্ন কমায়, উদ্বিগ্নতা কমায়, মোটর স্কিল এর উন্নতি ঘটায়, সৃজনশীলতা বাড়ায় ইত্যাদি। তবে ঘনঘন লুসিড ড্রিম দেখা আমাদের ঘুমের কোয়ালিটি নষ্ট করতে পারে।

৪) আমরা কখন দুঃস্বপ্ন দেখি?

~ইলা সাহা
চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ।

উত্তর: দুঃস্বপ্ন দেখার অনেক কারণ রয়েছে। তবে মূলত বিষণ্ণতা ও উদ্বিগ্নতা, ঘুমের সমস্যা অথবা কোনো শারীরিক সমস্যা এর কারণ হতে পারে। অথবা এমন কোনো বিষয় যা আপনার দুশ্চিন্তার কারণ - এটিও দুঃস্বপ্নের একটি কারণ হতে পারে।

৫) পারকিনসন্স ডিজিজ কি নিউরনকে নষ্ট করিয়ে দেয়?

~সামিহা আফসারা ইবনাত
নবম শ্রেণি, সরকারি পি এন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তর: একটি গবেষণা অনুসারে, তিনটি মলিকিউল - নিউরো ট্রান্সমিটার ডোপামিন, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ও একটি alpha synuclein নামের প্রোটিন মূলত নিউরন ধ্বংসের জন্য দায়ী এবং এই সকল মলিকিউল মূলত পারকিনসন রোগের কারণ। পারকিনসন রোগে আক্রান্ত হলে মস্তিষ্কের substantia nigra এলাকার নিউরন নষ্ট হতে থাকে। যার ফলে ব্যক্তির চলনে (হাঁটাচলা বা নড়াচড়া করতে) সমস্যা সৃষ্টি হয়।
তবে, নিউরন ধ্বংস হতে গেলে অবশ্যই এই তিনটি মলিকিউল এর সমন্বয় প্রয়োজন।

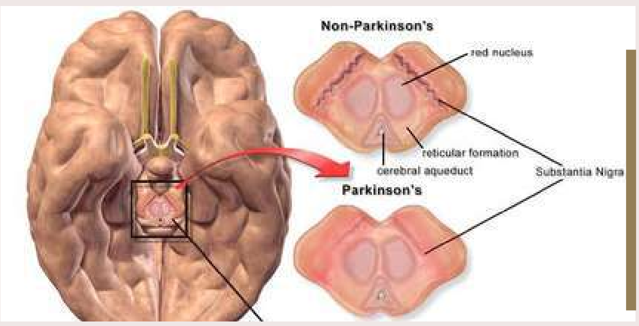

৬) Reflex action বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া কি কখনো বন্ধ হতে পারে?

স্বস্তিকা দে,
ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

উত্তর: হ্যাঁ, Reflex action বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্নায়ুর নানা জটিলতার কারণে বন্ধ হতে পারে। মেরুদণ্ড, স্নায়ুর মূল, পেরিফেরাল নার্ভ বা পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলে Reflex action বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া বন্ধ হতে পারে। সংবেদনশীল (অনুভূতি) বা মোটর (চালক) স্নায়ু বা উভয়ের ব্যাঘাতের কারণেও Reflex action বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া বন্ধ বা অস্বাভাবিক হতে পারে।

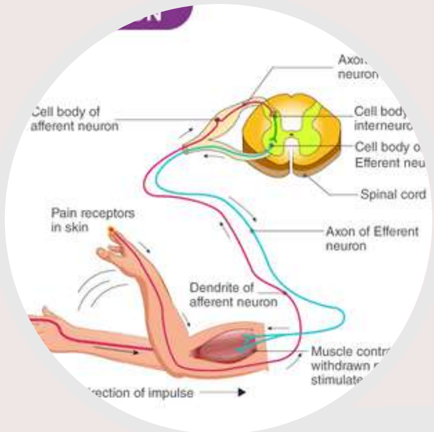

৭) জেরুজালেমে গেলেই কি আমাদের মধ্যে জেরুজালেম সিনড্রোম দেখা দিবে নাকি জেরুজালেম সিনড্রোম কম বেশি আমাদের সবারই আছে?

~অংকন দে,
চট্টগ্রাম কলেজ।

উত্তর: জেরুজালেমে গেলেই যে জেরুজালেম সিনড্রোম হবে ধারণাটি সত্য নয়। জেরুজালেম এখানে স্পিরিচুয়াল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। জেরুজালেম সিনড্রোম ইউনিক কোন রোগ নয়, এটি একটি সাইকো জিওগ্রাফিকাল ডিসঅর্ডার যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়, যেমন ইতালিতে ফ্লোরেন্স সিনড্রম (ঐতিহাসিক চিত্রকলা দেখে নিজেকে এর অংশ মনে করা এবং হিস্টরিকাল ক্যারেক্টারদের নিয়ে হ্যালুসিনেশন হওয়া) বা আমেরিকায় হোয়াইট হাউজ সিনড্রোম (নিজেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভাবা) ইত্যাদি। এটা যে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই হবে এমন না, রাজনীতি, সংস্কৃতি নানা ক্ষেত্রে অপরিমিত আকর্ষণের ফলে এই রোগ হতে পারে।
বলা যেতে পারে জেরুজালেম সিনড্রোম বা অন্যকোনো সাইকো জিওগ্রাফিকাল ডিসঅর্ডার কম-বেশি আমাদের সবার মাঝে আছে।

৮) ছেলেদের কি শুধু নীল আর মেয়েদের গোলাপি পছন্দ হয়? অর্থাৎ আমাদের রং পছন্দ হওয়া কি লিঙ্গ নির্ভর?

~মাহির আজরাফ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর: ২০০৭ সালে যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় লক্ষ করা গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ উভয়ের পছন্দের রঙের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে নীল। আরো লক্ষ করা গেছে, নারীরা পুরুষের তুলনায় লাল এবং লাল-এর কাছাকাছি রংসমূহ পছন্দ করে থাকে। সুতরাং, "ছেলেদের শুধু নীল এবং মেয়েদের শুধু গোলাপি রং পছন্দ"-একথাটি সত্য নয়। বিজ্ঞানী হার্লবার্ট এবং লিং এর মতে, আদিমকালে পুরুষেরা সাধারণত শিকারে যেত এবং নারীরা কৃষিকাজ এবং ফলমূল সংগ্রহ করতেন। পাকা ফলের লালচে রঙের প্রতি আকর্ষণে কারণে নারীদের লাল রঙের প্রতি ভালোলাগা তৈরি হয়। কিন্তু ফলের রং কেন নারীদের রং পছন্দ-অপছন্দে প্রভাব ফেলতো তা এখনো পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ, নারীদের পুরুষের তুলনায় লালচে রঙের প্রতি অধিক ঝোঁক কাজ করলেও এটি একেবারে চিরন্তন সত্য নয়।

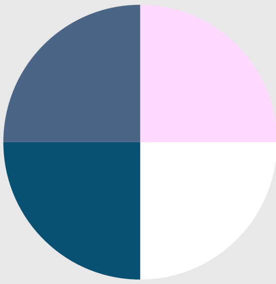

৯) সাধারণত দেখা যায়, ছোটকালে অনেকেই সিমেন্ট বা মাটি খায়? কেন?

~সামিহা আফসারা ইবনাত
নবম শ্রেণি, সরকারি পি এন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তর: সাধারণত খাবারযোগ্য নয় এমন জিনিস খাওয়া, এই আচরণের নাম "পিকা"। এটি একটি মানসিক সমস্যা। শিশুদের মধ্যে সাধারণত এই সমস্যাটি দেখা যায়। তবে শিশুরা সবসময় এই পিকা নামক মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় না। দুই বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই শিশুদের মধ্যে সিমেন্ট, মাটি এসব খাওয়ার স্বভাব থাকে। দুই বছরের বেশি বয়সী শিশুদের মধ্যে যদি এই আচরণ দেখা যায়, তাহলে পিকা রোগে আক্রান্ত বলে ধরা হয়। এছাড়াও পিকার অন্যান্য কারণগুলো হলো পুষ্টির অভাব (আয়রন বা জিঙ্ক), উন্নয়ন সমস্যা (অটিজম)।

১০) বর্ণান্ধতা কি মানসিক সমস্যা?

~সাইদ খান সাগর
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী

উত্তর: না, বর্ণান্ধতা মানসিক সমস্যা নয়। বর্ণান্ধতা একটি জেনেটিক সমস্যা। মানুষের চোখের ভিতরের রেটিনার "কোন" (Cone) নামক আলোকসংবেদী কোষ বা ফটোরিসেপ্টর (Photoreceptor) বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী। আমাদের চোখে তিন ধরনের কোন কোষ রয়েছে। এই তিন ধরনের কোনকোষ তিনটি মৌলিক রং শনাক্ত করতে পারে। এরা হলো লাল, সবুজ ও নীল। চোখের রেটিনায় যদি এই তিন রকমের কোনকোষের যেকোনো একটির, দুটির অথবা সবকটির মধ্যে ঘাটতি বা ত্রুটি দেখা যায়, তাহলেই বর্ণান্ধতার সৃষ্টি হয়।

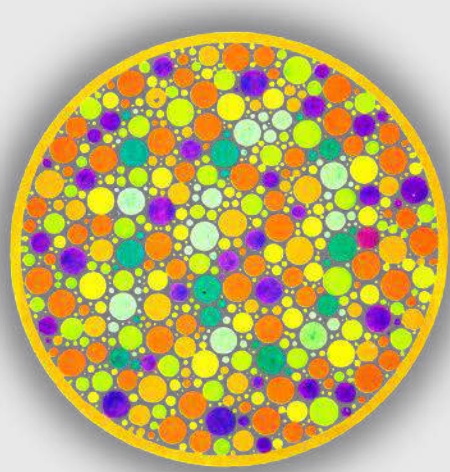

১১) ছেলেদের কি মুড সুইং হয়?

~ হিমাদ্রী দে
সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

উত্তর: হ্যাঁ, ছেলেদের মুড সুইং হয়। পুরুষেরাও নিয়মিত ইমোশনাল ব্রেকডাউনের মধ্য দিয়ে যায়। যেমন পিরিয়ড হলে নারীরা যায়। মেয়েদের মতো রেগুলার বেসিসে ছেলেদের ও হরমোনাল চেঞ্জ হয় যা তাদের ইমোশনালি ভালনারেবল করে তোলে। মানে মুড সুইং এর সূত্রপাত করে। এছাড়াও টেনশন, হতাশা থেকে মুড সুইং হয়।

১২) মানুষ স্বপ্ন কেন দেখে?

~ হিমাদ্রী দে
সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

উত্তর: স্বপ্ন একটি অবচেতন মস্তিষ্কের কিছু কাজ মাত্র। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের ঘুমের দুইটি পর্যায় রয়েছে। একটি র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট - আরইএম, অন্যটি নন র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট - নন আরইএম। দৈনন্দিন জীবনে ঘটনার তথ্য মানুষের মস্তিষ্কের 'থ্যালামাস' নামক অংশে জমা হয়। যখন মানুষ ঘুমায়, তখন এই থ্যালামাস বন্ধ বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। ফলে আমরা অতীতের ঘটনার কিছু অংশ অবয়ব আকারে স্বপ্নে দেখতে পাই।

১৩) দেজাভু কি আসলেই ভ্রম?

~ মৃত্তিকা দে
চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তর: দেজাভু নিয়ে এখনও অনেক গবেষণা চলছে। তবে বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের মস্তিষ্কের সাময়িক স্থবিরতা কে দেজাভুর কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে। তাছাড়া স্নায়ু তন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া বিঘ্নিত হাওয়া আরেকটি অন্যতম কারণ। আগে মনে করা হত দেজাভু আসলে পূর্বজন্মের কথা। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এটা মানুষের স্মৃতির এক বিশেষ বহিঃপ্রকাশমাত্র। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে মস্তিষ্কের মধ্যে ঘটা তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় এটা। একই ঘটনার সংকেত মস্তিষ্কে দু'বার পাঠানো হয়, ফলে পরের বার্তাটি আগের বার্তাটিকে পূর্বের অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরা দেয়। যার কারণে দেজাভু হয়ে থাকে।

১৪) বোবা ধরা বা স্লিপিং প্যারালাইসিস কি?

~ ওমর ফারুক
দশম শ্রেণী, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল।

উত্তর: স্লিপিং প্যারালাইসিস হলো একধরনের parasomnia। যখন ব্যক্তি প্রায় জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থার মাঝামাঝিতে থাকেন, তখন এই স্লিপিং প্যারালাইসিস ঘটে। সাধারণত ব্যক্তির ২০-৩০ বছরের মধ্যে এটি বেশি ঘটে থাকে। এই সময় সাধারণত হ্যালুসিনেশন হয়ে থাকে। যেই সময়ে স্লিপিং প্যারালাইসিস ঘটে সেই সময়ে দেহ REM পর্যায়ের সাথে সমন্বয় ঘটায় না। যার ফলে ব্যক্তি জাগ্রত পর্যায়ে থাকলেও তাদের শরীর ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। যদিও এতে তেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই, তবে উদ্বিগ্নতা ও বিষণ্ণতার কারণে এরকম হয়ে থাকে। আবার narcolepsy এর একটি কারণ। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

Image Source: svefnsetrid.ru.is

১৫) স্বপ্ন থার্ড পারসন ভিউতে কেন দেখি আমরা?

~ ওমর ফারুক
দশম শ্রেণী, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল।

উত্তর: স্বপ্ন ফার্স্ট পরশন বা থার্ড পরশন ভিউতে দেখার জন্য দায়ী হলো আমাদের নিজেদের মস্তিষ্ক। স্বপ্ন প্রায়শই আমাদের চিন্তাভাবনা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক আচরণের সমষ্টিগত ফলাফল। টিভি শো ও সিনেমা দেখা বা ভিডিও গেম খেলার সময় আমরা ঘটনাগুলো তৃতীয় ব্যক্তির চোখে দেখি। আবার কোনো ঘটনা যখন আমাদের মনে অধিক আনন্দ, অধিক ভীতি বা আশ্চর্যের অনুভূতি যোগায়, তখন আমাদের মস্তিষ্ক তা ধারণ করে রাখে এবং আমরা আবার থার্ড পরশন বা তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে দেখে থাকি।

১৬) মাঝে মাঝে হঠাৎ করে গা কেঁপে উঠার কারণ কী?

~ নূরে ওয়াকিয়া
ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

উত্তর: সাধারণত ভারসাম্যহীনতা ও শরীরের কিছু হরমোনাল ও নিউরিটিক পরিবর্তনের ফলে এমনটা হয়ে থাকে। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা বা ভয় কিংবা অতি উদ্বেগের ফলে এড্রোন্যালাইন হরমোন নিঃসৃত হয় এবং এই হরমোন স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে হাত ও পায়ের পেশিগুলোর রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দেয়। ফলে হাত-পা কেঁপে উঠে। আবার অতিরিক্ত কফি ও অ্যালকোহল সেবন, হাঁপানি রোগীদের ব্যবহৃত ইনহেলার, বিভিন্ন খিঁচুনির ওষুধও এর জন্য দায়ী। দেহে ভিটামিন ও খনিজ লবণের ঘাটতিও এর অন্যতম কারণ।

১৭) বুক আর পেটে মাঝামাঝি স্থানে ঘুষি দিলে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ব্যথা করে কেন?

~ অনুভব রুদ্র
দশম শ্রেণী, নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

উত্তর: বুক ও পেটের মাঝামাঝি স্থানে আংশিক লিভার বা যকৃত ও অন্ত্র অবস্থিত যা কোনো শক্ত পেশি বা হাড় দিয়ে সুরক্ষিত নয়। এমনিতেই মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থি যকৃত নরম। তাই ঘুষি দিলে তা সরাসরি যকৃতে আঘাত করে এবং প্রচণ্ড ব্যথা হয়। পাশাপাশি এক্ষেত্রে বৃহদান্ত্রের শেষ প্রান্তে লাগানো অ্যাপেন্ডিক্স মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার কারণে ব্যাপকভাবে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত ঘটে ও মৃত্যুঝুঁকি দেখা দেয়।

WHITE BOARD SCIENCE CLUB
WE ARE CALLING YOU FOR BEING A
LEADER
COME AND JOIN US
LEAD THE CLUB TO ITS POTENTIAL FUTURE
UTILIZE YOUR LEADERSHIP POTENTIAL
BE INDEPENDENT WHILE MAKING DECISIONS
ENRICH YOUR SKILLSET AND EXPERIENCE
HAVE FUN WITH A COMMUNITY
MEET NEW PEOPLE LIKE YOU
AND MANY MORE
APART FROM THESE, WBSC MEMBERS GET RESEARCH AND INTERNSHIP OPPORTUNITIES, SKILLSET TRAINING SESSIONS, ARRANGE FUN MEETUPS, AND WORK TOGETHER OUTSIDE THE CLUB FOR HUMANITY'S BETTERMENT.

টেরারিয়াম এ তৈরি এক ছোট্ট পৃথিবী

টেরারিয়াম

মায়ের সাথে প্রতিদিনকার মতোই হাঁটতে বের হয়েছে ছোট্ট নায়রা। চারপাশের রঙচঙে হাজারো জিনিসের মাঝে হঠাৎই তার নজর কেড়ে নেয় অপরূপ সুন্দর একটি কাঁচের পাত্র। একটি বদ্ধ কাঁচের পাত্রের ভেতরে পাথুরে বন্ধুর পরিবেশে ফুটে উঠা অদ্ভুত সজীব শ্যামল অনাবিল সৌন্দর্য্যের ছোট্ট একরত্তি বাগান। কাঁচের পাত্রে কীভাবে গাছগুলো বেঁচে আছে তা প্রশ্ন হয়ে উঁকি দেয় তার মাথায়। মাকে জিজ্ঞাসা করতেই চমকপ্রদ সব তথ্য জানান তিনি! পৃথিবীতে এই বৃক্ষ সজ্জা বা টেরারিয়াম বহু যুগ আগে থেকেই, সেই রাণী ভিক্টরিয়ার আমল থেকেই নাকি প্রচলিত ছিলো। ঘর-বাড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাঁচের বোতলের মধ্যে গাছ বা লতা-গুল্ম লাগানো হতো। এটি এক ধরণের শিল্প যা পরবর্তীতে "টেরারিয়াম বাগিচা" নামে পরিচিতি পায়।

'টেরারিয়াম' হলো মুখবন্ধ এক ধরনের কাঁচের পাত্র, যা আর্দ্রতা বজায় রেখে উদ্ভিদ ও গাছপালা জন্মাতে সহায়তা করে। কাঁচের তৈরি এই বদ্ধ পাত্র গাছের বৃদ্ধির জন্য একটি আদর্শ অনুকূল পরিবেশ।

স্বচ্ছ কাঁচের দেয়ালের মধ্য দিয়ে তাপ এবং আলো গ্রিন হাউজের মতই প্রবেশ করতে পারে। আবদ্ধ পাত্রে তাপ প্রবেশের কারণে মাটিতে যে পানি শোষিত থাকে তা বাষ্পীভূত হয়ে কাঁচের দেয়ালে জমে থাকে তা আবার ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে অনেকটা জলচক্রের মতো। আর এই ভাবেই একটি টেরোরিয়াম বেঁচে থাকে বহু বছর। এর ভেতরে ক্ষুদ্র বাগান তৈরি করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা কাচেঁর বোতলে করা হয় বলে অনেকে এটাকে 'বটল গার্ডেন' বা বোতল বাগানও বলে থাকেন। কাঁচের বয়াম বা পাত্র ছাড়াও স্বচ্ছ যে কোন পাত্রের মধ্যে টেরোরিয়াম করা সম্ভব। টেরারিয়ামে সাধারণত মাছের চৌবাচ্চার মতোই অলঙ্কারসমৃদ্ধ গাছ রাখা হয়।

টেরারিয়াম

টেরারিয়ামের উৎপত্তি

টেরারিয়ামের উৎপত্তি ভিক্টোরিয়ান যুগে, ১৮২৭ সালে ডা. নাথানিয়েল ব্যাগশ ও ক্যাটারফিলার একত্রে টেরোরিয়াম নিয়ে গবেষণা করেন। তখন তাঁরা দেখতে পান বয়ামের তলানিতে ছোট ছোট ফার্ন বেড়ে উঠছে এবং সংরক্ষিত কাঁচের ভেতর বাতাস ছাড়া গাছ জন্মাচ্ছে। পরবর্তীতে এটাই ওয়ারডিয়ান কেইজ বা টেরোরিয়াম নামে পরিচিতি লাভ করে। নাথানিয়েল ব্যাগশই বিশ্বের প্রথম মানুষ, যিনি ১৮৪২ সালে টেরারিয়ামের মধ্যে সুদৃশ্য বাগিচা তৈরি করেছিলেন। এ শব্দটি ভিভারিয়াম নামক একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। অ্যাকুয়ারিয়াম শব্দের উৎপত্তিও ভিভারিয়াম থেকেই। ভিভারিয়ামের অর্থ বদ্ধপরিসরে স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলা। টেরা অর্থ স্থলভাগ। ভিক্টোরিয়ান যুগে ব্রিটেনের অভিজাতদের বাড়ির ড্রয়িংরুমে, রাখা থাকত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ দিয়ে সাজানো টেরারিয়াম। উদ্ভিদগুলো এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হতো ব্রিটেনে।

> "টেরারিয়াম' হলো মুখবন্ধ এক ধরনের কাঁচের পাত্র, যা আর্দ্রতা বজায় রেখে উদ্ভিদ ও গাছপালা জন্মাতে সহায়তা করে।"

ইংল্যান্ডের গালফোর্ড শহর থেকে ১৩ কি.মি. দূরে আছে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় গ্রাম ক্রেনলে। ১৯৬০ সালে সেখানে বাস করতেন ২৫ বছরের ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড ল্যাটিমার ও তাঁর স্ত্রী গ্রিচেন। অফিস থেকে ফিরেই ডেভিড ব্যস্ত হয়ে পড়তেন বাগান নিয়ে, সেটিই ছিলো তার শখ। তিনি তাঁর বাড়িতে লাগিয়েছিলেন বিরল প্রজাতির গাছ। তবে বড় গাছের চেয়ে সহজে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় এমন গাছই তিনি লাগাতেন বাড়ির বাগানে।

ডেভিড ল্যাটিমার ও তার ৬১ বছর বয়সী টেরারিয়াম

> ১৯৬০ সালের ১৭ এপ্রিলে বাগান পরিচর্যার সময় হঠাৎ-ই ডেভিডের মাথায় আসে 'টেরারিয়াম বাগান' তৈরির ভাবনা।

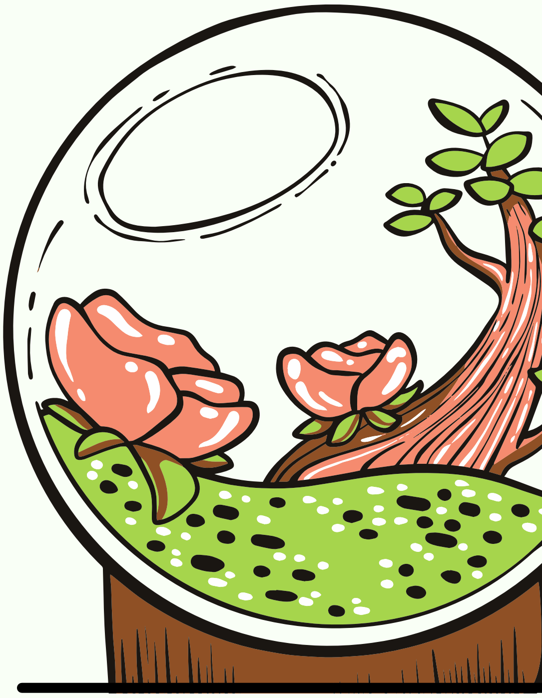

১৯৬০ সালের ১৭ এপ্রিলে বাগান পরিচর্যার সময় হঠাৎ-ই ডেভিডের মাথায় আসে 'টেরারিয়াম বাগান' তৈরির ভাবনা। নাথানিয়েল ব্যাগশ নামের এক বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানীর লেখা পড়েছিলেন ল্যাটিমার, তখনই হাতের কাজগুলো রেখে বাজারে চলে যান ল্যাটিমার। খুঁজতে শুরু করেন বৃহৎ এক কাঁচের পাত্র, যেটির মধ্যে তিনি তার ক্ষুদ্র বাগান তৈরি করবেন। তখন অবশ্য প্লাস্টিক বোতল এসে যাওয়ায় বড় কাঁচের বোতলের দেখা পাচ্ছিলেন না ডেভিড। এরপর ডেভিড পুরনো কাঁচের বোতলের দোকানে গিয়ে একটি ১১ গ্যালনের কাঁচের পাত্র জোগাড় করেন এবং এর ভেতর স্পাইডারওয়ার্ট স্প্রাউট রোপণ করেন। যা পরবর্তীতে হয়ে উঠে পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন টেরারিয়াম এবং গত ৬১ বছর ধরে এর ছিপি কখনোই খোলা হয়নি। ফলে এই দীর্ঘ সময়ে এই বোতলের ভিতরে গড়ে উঠেছে একটি বদ্ধ বাস্তুতন্ত্র, যা নিজেই নিজেকে রক্ষা করে চলেছে দীর্ঘ সময় ধরে।

স্পাইডার ওয়ার্টস উদ্ভিদগুলোর জীবনধারনের জন্য দরকার ছিলো জল, খনিজ পদার্থ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ও সূর্যালোক। সূর্যালোক বাদে সবকিছুই উদ্ভিদগুলো জোগাড় করে নেয় বদ্ধ জারের ভিতর থেকেই। দিনের বেলা সৌরশক্তির সাহায্যে উদ্ভিদগুলো নিজেদের খাবার তৈরি করে নেয়, বাইরে থেকে কোনো কিছুর আদান-প্রদান হয় না। গাছটি অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং মাটিস্থ হিউমাস থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। গাছের ঝরে যাওয়া পাতা ও অন্যান্য অংশ মাটিতে পড়ে ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমে পুনরায় সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং এর ফলে জৈব বস্তু ভেঙ্গে গিয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইডও বায়ুতে আসে। প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মাটিতে জমা হয় এবং মূলের মাধ্যমে পুনরায় গাছ শোষণ করে। ফলে একটি জল চক্রও তৈরি হয়। গাছের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদান গাছ আর মাটি হতেই পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয় বলে এতে বাইরে থেকে কিছুই সরবরাহ করতে হয় না।

মাটিতে থাকা আণুবীক্ষণিক জীবেরা পাতা পচিয়ে নিজেদের খাবার জোগাড় করে নেয়। পঁচা পাতাই হয়ে উঠে উদ্ভিদটির সার। সেই সার থেকে উদ্ভিদগুলো গ্রহণ করে খনিজ পদার্থ। এইভাবেই জারের ভিতরে গড়ে উঠেছে এক পৃথক বাস্তুতন্ত্র; এক পৃথক পৃথিবী। যার আছে নিজস্ব বাতাস, মাটি,পানি, উদ্ভিদ ও প্রাণ। তবে একেবারে শুরুতেই বোতলের গাছটিকে সীল করে দেওয়া হয়নি। এর পর থেকে বিগত ৪৮ বছর এটি বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে জীবনচক্রের এই অসাধারণ উদাহরণটি গত ২৮ বছর ধরে ল্যাটিমারের বাড়ির একই জায়গায় রাখা আছে।

১৯৬০ সালের পর, মাত্র একবার এ জারের ভিতরে জল দিয়েছিলেন ল্যাটিমার। দীর্ঘ ১২ বছর পর বোতলটিকে একবার খুলে জল দিয়ে স্থায়ীভাবে সিল করে দিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে। সেই ১৯৭২ সালে যখন নিক্সন ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তারপর থেকে আজ অবধি, প্রায় ৪৮ বছর ধরে জারটি সম্পূর্ণ সিল করা অবস্থায় আছে, ৮৫ বছরের ডেভিড ল্যাটিমারের বাড়িতে। জারের ভেতরের পৃথিবীর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। ঐতিহাসিক টেরোরিয়াম জুড়ে থাকা স্পাইডারওয়ার্ট উদ্ভিদগুলো মানুষের পৃথিবী থেকে কিছু নেয় না। তারা ঋণী একমাত্র সূর্যের কাছে। এভাবেই তারা বেঁচে থাকে নিজস্ব পৃথিবী থেকে রসদ সংগ্রহ করে।

চাইলে যেকোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এধরনের টেরারিয়াম এ গাছ রোপণ করা। এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলী মেনে চললেই হবে।

সাধারণত দুই ধরনের টেরারিয়াম লক্ষ করা যায়। যেমন-
১. একপার্শ্বে উন্মুক্ত টেরারিয়াম ও
২. বদ্ধ টেরারিয়াম।

চিত্র: একপার্শ্বে উন্মুক্ত ও বদ্ধ টেরারিয়াম

এদের মধ্যে বদ্ধ টেরারিয়াম তার অভ্যন্তরে আর্দ্র পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই বদ্ধ টেরারিয়াম এর জন্য গাছ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছগুলো আর্দ্র মাটি ও আর্দ্র বাতাসে টিকে থাকার উপযোগী হয়।

টেরারিয়াম তৈরির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক উপকরণগুলো হলো- নুড়িপাথর, জৈব সারযুক্ত উর্বর মাটি, একটিভেটেড চারকোল এবং কিছু ঔষুধি তৃণমূল।

টেরারিয়াম তৈরির প্রস্তুতি

টেরারিয়াম তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি দেখে নিতে পারো এক নজরে-

১ পানি নিষ্কাশন সুনিশ্চিত করার জন্য পাত্রটির তলায় ০.৫ থেকে ১ ইঞ্চি নুড়িপাথর রাখতে হবে।

২ নুড়িপাথর এর উপরে ০.৫ থেকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ এক্টিভেটেড চারকোল রাখতে হবে। এর ফলে বদ্ধ পরিবেশেও পাত্রের অভ্যন্তরীণ বাতাসের ফিলট্রেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

৩ এ পর্যায়ে পাত্রে ১ থেকে ২ ইঞ্চি পরিমাণ উর্বর মাটির স্তর যোগ করতে হবে।

৪ এ পর্যায়ে গাছ রোপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বদ্ধ পরিবেশে অনায়াসে বেড়ে উঠতে পারে এমন গাছ নির্বাচন করতে হবে। ছোট ছোট ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ এবং ঔষুধি গুল্মগুলোই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। গাছ রোপণের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন অতিরক্ত গাছ রোপণ করা না হয়। অতিরিক্ত গাছ রোপণ করা হলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, প্রস্বেদন, অভিস্রবণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৫ গাছগুলো রোপণের জন্য মাটির স্তরটিতে হালকা গর্ত করে তাতে গাছের শেকড় গুজে দিতে হবে এবং গাছে পানি দিতে হবে। তবে কোনোভাবেই অতিরিক্ত পানি দেওয়া যাবে না। মাটি ভিজে গেলে পানি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। মাটি যেন অতিরিক্ত স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে না যায় এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬ এ ধাপে পাত্রটি ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করে পর্যাপ্ত আলো পায় এমন স্থানে রাখতে হবে। তবে কোনভাবেই সরাসরি সূর্যের আলোর নিচে রাখা যাবে না। কেননা টেরারিয়ামটি কাঁচের পাত্র হওয়ায় পাত্রটি তার অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত আলোকে ইন্টেন্সিফাই করে। তাই টেরারিয়ামটি সরাসরি সূর্যের আলোর নিচে রাখা হলে গাছের ডিহাইড্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মায়ের গল্পের মাঝে নতুন এক জগৎ খুঁজে পায় নায়রা। সুদূর ইংল্যান্ড এর ডেভিড ল্যাটিমার এর টেরারিয়াম বাগিচা অনলাইনে দেখে উৎসাহিত হয়ে একসাথে ঘরে বসে তৈরি করে ফেলে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি স্বর্গোদ্যান। বানানোর পর এটিকে ঘরের পছন্দমতো একটি কোণে রেখে নায়রা অনুভব করে অন্যরকম শান্তি ও স্নিগ্ধতার পরশ। ব্যস্ত দিন শেষে ক্লান্ত শরীরে সোফায় বসে সবুজাভ টেরারিয়ামের দিকে এক পলক দৃষ্টিই যেন মায়েরও সারাদিনের সকল ক্লান্তি দূর করে দেয়।

লেখনীতে:
নাজিফা গওহার, আঈশা নূর, তাসনিম চৌধুরী আদিবা, আরিফ আবরার নাঈম, হাসপিয়াত তোরাবী।

সোর্সঃ Thewaal.in/magazine, Gardenista.com, Daily-bangladesh.com, Ekushey-tv.com

স্বপ্নযাত্রার গল্প

ইনান ও জাইমা

নবম শ্রেণি ও চতুর্থ শ্রেণি,
স্বর্ণপদক জয়ী,
ইন্টারন্যাশনাল রোবট
অলিম্পিয়াড-২০২০

"ছোটবেলা থেকে মা-বাবার অনুপ্রেরণায় scratch, C, C++, python, বিজ্ঞানবাক্স নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে শুরু হয় ইলেকট্রনিক্সের প্রতি ভালো লাগা যা কোভিড কালীন সময়ে ছড়িয়ে পড়ে তার ছোটবোনের মাঝেও। কথা বলছি 'ইন্টারন্যাশনাল রোবট অলিম্পিয়াড-২০২০' এর মত বড় প্লাটফর্মে জুনিয়র গ্রুপের critic ক্যাটাগরিতে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্বর্ণপদক জয়ী মিসবাহ উদ্দিন ইনান এবং তার ছোট বোন জাইমা জাহিন ওয়ারাকে নিয়ে। চট্টগ্রামের মেধাবী এই ভাইবোন প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে 'ইন্টারন্যাশনাল রোবট অলিম্পিয়াড-২০২১' প্রতিযোগিতায় 'Robot in Movie' ক্যাটাগরিতে স্বর্ণ পদক জয়ের মাধ্যমে এবছর তাদের ঝুলিতে সংযোজন করেছে আরো একটি রেকর্ড। এই যাত্রার শুরু হওয়ার গল্প থেকে শুরু করে তাদের অর্জন, উপলব্ধি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নতুনদের প্রতি পরামর্শ ইত্যাদি নিয়ে তাদের সাথে কথা বলেছেন হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর মাহির আজরাফ। আশা রাখি যে তাদের এই কথোপকথন থেকে নতুনরা অনুপ্রাণিত হয়ে রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ পাবে এবং তোমাদের থেকেই কেউ হয়তো অবদান রাখবে আগামীর হরেক প্রযুক্তিতে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মাহির আজরাফ।"

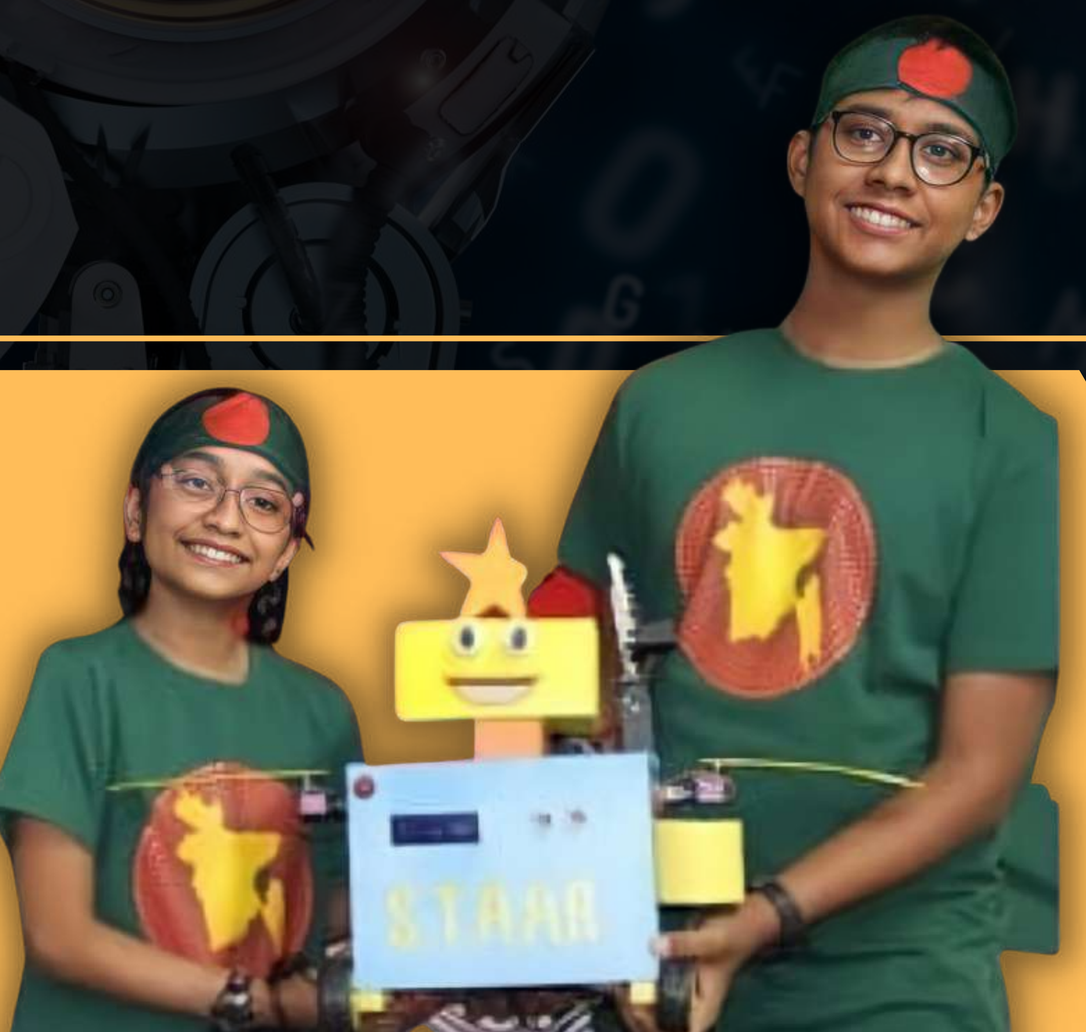

মাহিরঃ সবার শুরুতে যেই জিনিসটা জানতে চাচ্ছি সম্প্রতি রোবটিক্স অলিম্পিয়াডে তোমার যে অর্জন তা নিয়ে তোমার তাৎক্ষনিক অনুভূতি কি ছিল?

ইনানঃতাৎক্ষনিক অনুভূতি বলতে খুব ভাল লাগছিল। আমরা যে রাত জেগে জেগে রোবট বানানোর কাজ করেছি, এতটা সময় দিয়েছি সে পরিশ্রম টা সার্থক হয়েছে। অনেক Joyful লাগছিল।

মাহিরঃ তুমি কোন ক্লাসে পড় এখন ?

ইনানঃ আমি ক্লাস নাইনে উঠব জানুয়ারিতে।

মাহিরঃ তোমার বোনও কি তোমার সেইম ব্যাচ নাকি জুনিয়র?

ইনানঃ ও ক্লাস ফোরে পড়ে।

মাহিরঃ এইযে তোমাদের এত ছোট বয়সে এত বড় অর্জন এটার শুরুটা হয়েছিল কিভাবে?

ইনানঃ আমার আসলে প্রোগ্রামিং শেখার পর থেকেই রবোটিক্স এর প্রতি আগ্রহ জন্মায়। কোভিড পিরিয়ডে আমি রবোটিক্স অলিম্পিয়াড সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। আমার ফ্যামিলি আমাকে ইন্সিস্ট করছিল যেন আমি আমার বোন কে নিয়ে টিমআপ করি। কারণ প্যান্ডেমিকের সময় বাইরের কাউকে টিমে নিলে সে বাসায় আসলে তা সবার জন্য আনসেইফ হত। আমার বোন কে নিয়ে টিমআপ করাতে আমার একদিক থেকে লাভই হচ্ছিল কারণ ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিষয়গুলো নিয়ে আমার আরও ঘাঁটাঘাটি করতে হয়। এতে ও নিজেও যেমন শিখছিল, তেমনি আমিও বিষয়টিতে আরও তুখোড় হয়ে উঠছিলাম। সো এভাবে আমরা টিমআপ করে "বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২০" এ অংশগ্রহণ করি। সেখানে আমাদের টিমটি সিলেক্ট হয়।পরবর্তীতে আমরা "ইন্টারন্যাশনাল রোবট অলিম্পিয়াড ২০২০" এ স্বর্ণপদক জয় করি "Critics Category" জুনিয়র গ্রুপে। এটি এই ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের প্রথম "Gold Medal"। আমাদের জন্য পুরো প্লাটফর্ম, রোবটিক্স নিয়ে একটি কম্পিটিশন পুরো বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত নতুন ছিল, বিশেষ করে ওয়ারার জন্য তো তখন রোবটিক্স বিষয়টিই সম্পূর্ণ নতুন ছিল। এ বছরে ওয়ারা ইন্টারনেটের হেল্প নিয়ে নতুন অনেক কিছু শিখে, আমিও ওকে গাইড করি, আমিও আরও এডভান্সড জিনিস শিখি। এবছরও আমাদের টিম "বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড" এ উত্তীর্ণ হয়। "ইন্টারন্যাশনাল রোবট অলিম্পিয়াড ২০২১" এ "Critics Category" জুনিয়র গ্রুপে আমরা একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করি এবং "Robot in Movie Catagory" জুনিয়র গ্রুপে আমরা একটি "Gold Medal"। অর্জন করি। "Robot in Movie Category" তেও আমরাই এবছর প্রথম "Gold Medal" অর্জন করেছি জুনিয়র গ্রুপে

মাহিরঃ তাহলে বলা যায় তোমাদের দুজনের জন্যই এটা একটা চমৎকার অনুভূতি। এই করোনা সময়কালে তোমাদের সুন্দর একটা জার্নি হয়ে গেল। তোমার কখন থেকে রোবটিক্স এর প্রতি আগ্রহ জন্মালো?

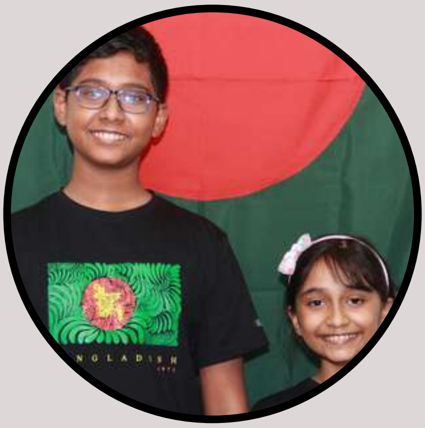

ইনানঃ রোবটিক্স আসলে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের সমন্বয়। আমাদের একটি Microcontroller বোর্ডে প্রোগ্রাম লিখতে হয় আর ঐ বোর্ডটি অন্যান্য হার্ডওয়্যারকে চালায়। প্রোগ্রামিং এবং ইলেক্ট্রনিক্স এই দুইটি বিষয় মিলিয়ে রোবটিক্স এর সেগমেন্ট টি ক্রিয়েট হয়।ক্লাস থ্রি তে থাকতে আমি "Scratch" আয়ত্ত করি। "Scratch" হল বাচ্চাদের মজার জন্য একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে গেম বানানো যায়। এটা করতে আমার খুব ভাল লাগত। এরপর ক্লাস ফোর-ফাইভের দিকে আমি C, C++, Python প্রগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে আরম্ভ করি। তখন থেকেই আমার প্রোগ্রামিং এর প্রতি একটা ভাল লাগা কাজ করতে থাকে। প্রোগ্রামিং, কোডিং, বিভিন্ন কনটেস্ট করতে আমার ভাল লাগত। তখন যদিও আমি কনটেস্টে তেমন একটা যেতাম না। আমাদের অন্যরকম বিজ্ঞান বাক্স যেগুলো আছে যেমনঃ শব্দকল্প, আলোর ঝলক এগুলো মা, বাবা কিনে দিত। আমি বাসায় বসে বসে সেগুলো এক্সপেরিমেন্ট করতাম। এসব এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে মনে হয় যে আমি ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়টা সহজভাবে বুঝতে শুরু করি, কোনটা পজিতিভ কোনটা নেগেটিভ। কোনটা ডায়োড, রেজিস্টারের কাজ কি। ক্লাস ফাইভে থাকতে আমাদের স্কুলে একটা ক্যাম্প আয়োজিত হয় যার মাধ্যমে আমি রোবটিক্স নামের সেগমেন্টের সাথে পরিচিত হই। সেখানে একটি "Arduino Board" ছিল যেখানে আমাদের প্রোগ্রাম করতে হয়। Arduino Programming এবং C Programming সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি যেহেতু C Programming আগে থেকেই জানতাম তাই আমার জন্য Arduino Programming খুব সহজ ছিল। যেহেতু বিজ্ঞান বাক্সের এক্সপেরিমেন্ট গুলো করতে করতে ইলেক্ট্রনিক্সের প্রতি আমার একটা ভালবাসা জন্মায়, তাই রোবটিক্স করতেও আমার অনেক ভাল লাগত। আমি ইন্টারনেটে দেখে দেখে বিভিন্ন সেন্সরের কাজ শিখতে শুরু করি। তখন থেকেই রোবট বানাতে পছন্দ করতাম, তবে কোন কম্পিটিশনের জন্য না হলেও ছোট ছোট প্রজেক্ট করতাম যেমনঃ বাসার জন্য সোপ ডিস্পেন্সার। পরে আমি "বাংলাদেশ রোবটিক্স অলিম্পিয়াডের সাথে পরিচিত হই। এটি একটি রোবটের কম্পিটিশন, যেখানে আপনি আপনার রোবট প্রদর্শন করবেন, জাজরা সেটার Efficiency, Manufacturing Process, Pricing এসব দেখে জাজমেন্ট করে। এভাবেই আমি রোবটিক্সের সাথে পরিচিত হই।

"প্রোগ্রামিং এবং ইলেক্ট্রনিক্স এই দুইটি বিষয় মিলিয়ে রোবটিক্স এর সেগমেন্ট টি ক্রিয়েট হয়।"

মাহিরঃ তাহলে তোমার মতে তোমার বয়সী যারা রোবটিক্স নিয়ে আগ্রহী, এসব কম্পিটিশনে যেতে চায় তাদের জন্য কোডিং এর Knowledge আগে থেকে জানা থাকলে সেটা Helpful হবে ?

ইনানঃ যাদের কোডিং এর প্রতি Fascination আছে তাদের রোবটিক্স জিনিসটা আরও সহজ লাগবে, দ্রুত শিখতে পারবে। কিন্তু তাই বলে এমন না যে আমার কোডিং সম্পর্কে ধারণা না থাকলে রোবটিক্স

শুরু করব না। একজন আমার সামনে রোবট প্রদর্শন করছে আমার দেখে ভাল লাগছে, আমারও একটা রোবট বানাতে ইচ্ছে হল কিন্তু আমি তো কোডিং পারি না কেমনে বানাব ? সেটা না এখন অনেক ধরণের বোর্ড আছে যেমনঃ Micro bit, Tinkercard ও Popup Box দিয়ে রোবটের কোডগুলো দেয়া যায়। এরকম অনেক পদ্ধতি আছে যেগুলো দিয়ে কোডিং ছাড়াও রোবটিক্সে আগ্রহ বাড়ানো যায়। রোবটিক্স একবার শুরু করলে রোবটিক্স এর প্রতি ভালবাসা জন্মাবে, সেজন্য রোবটিক্স কন্টিনিউ করা সম্ভব হবে। আগ্রহ তৈরি হলে তখন তার যেই ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হবে কোন এডভান্সড প্রজেক্ট করার জন্য সেটা সে সহজেই শিখতে পারবে।

"যাদের কোডিং এর প্রতি Fascination আছে তাদের রোবটিক্স জিনিসটা আরও সহজ লাগবে, দ্রুত শিখতে পারবে।"

মাহিরঃ ফ্যামিলির কথাতে এবার আসা যাক। তুমি তো বললে তমার আম্মু তোমাকে ছোট বয়স থেকেই তোমার জার্নিতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের মধ্যে একটা Stereotype দেখা যায় যেমনঃ মা-বাবারা এসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় নিরুৎসাহিত করে থাকেন পড়াশোনার বাইরে এসব করলে পড়ার ক্ষতি হবে, ফ্যামিলি থেকে একটা প্রেশার থাকে। তোমার পুরো জার্নিতে তুমি ফ্যামিলি থেকে কেমন Support পেয়েছ এবং সেটা তোমাকে কিভাবে Inspire করেছে ?

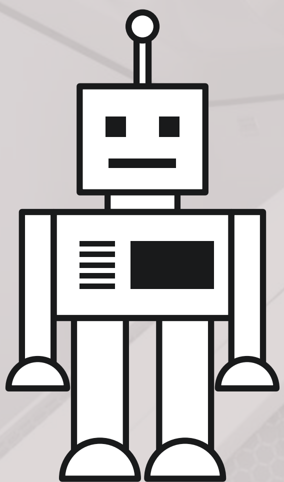

ইনানঃ আমার পুরো জার্নিতে আসলে আমার ফ্যামিলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আমার মা-বাবা সবসময় যেকোনো Extracurricular Activites যেমনঃআমি রোবটিক্স এর পাশাপাশি আবৃত্তি করি, গিটার বাজাই আরও অনেক কিছু করি এসব ক্ষেত্রে তারাই আমাকে Support দেয়, আমার বোনকে Support দেয়। তারা সবসময়য় একটা "Smart Way" Provide করার চেষ্টা করে। হয়ত আমি একটা জিনিস শুরু করেছি শুরুতে তেমন ভাল করছি না, তখন আমার মন খারাপ হলে আমার মা আমাকে উৎসাহ দেয়, আমি যেন Proper Guidance পাই তা নিশ্চিত করে। আমাদের বাবাও আমাদের সবসময় Encourage করে। ফ্যামিলি থেকে এমন হেল্প পাওয়া সত্যিই আমাদের জন্য Plus Point।

মাহিরঃ ফ্যামিলি তো অবশ্যই হেল্প করেছে, কিন্তু এর বাইরে তুমি কাদের কথা উল্লেখ করতে চাও যারা তমাকে গাইড করেছে?

ইনানঃ "বাংলাদেশ রোবটিক্স অলিম্পিয়াড" কমিটি। আমরা যখন ২০২০ এ প্রথমবার অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করি, আমাদের অনেক হেল্প করে; "ইন্টারন্যাশনাল রোবটিক্স অলিম্পিয়াড" এর জন্য Mentoring করে যা আমাদের রোবটিক্স অলিম্পিয়াডে এগিয়ে দেয়। তাদের এই হেল্পটা আমরা সবসময় পেয়ে এসেছি। এছাড়া "বাংলাদেশ শিশু একাডেমি", "বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি" কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই।

মাহিরঃ তুমি তো রোবটিক্সের পাশাপাশি আরও অনেক কিছুর সাথে জড়িত, পড়াশোনাও করছো। তো এবার তোমার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে তুমি Time Management কিভাবে কর, সব Balance কিভাবে কর ?

ইনানঃ Balance জিনিসটা আসলে এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই দেখা যায় Extracurricular Activities করতে গিয়ে Balance না করতে পেরে পড়াশোনার ক্ষতি করে ফেলে। যেটা থেকে একটা ভুল ধারণা মনে জন্ম নেয় যে Extracurricular Activites করলে আমি পড়াশোনায় যথাযথভাবে মন দিতে পারব না। আমার মা এক্ষেত্রে একটি কথা বলেন, "সময়ের কাজ সময়ে"। যখন আমার পড়ার সময় তখন আমি পড়ে ফেললাম। এর মানে এই না যে আমাকে সারা দিন পড়তে হবে, আমার মা বলেন একদিনের জন্য আমার মতে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পড়াই যথেষ্ঠ। এখানে আসলে প্রধান ব্যাপার Regularity Maintain করা। প্রতিদিনের পড়া করে ফেললে মাস শেষে দেখা যাবে তোমার সব পড়া হয়ে গেছে। প্রতিদিনের কিছু Goals Set করি, কখন থেকে কখন পড়ব, কখন ইংলিশ অলিম্পিয়াডের জন্য প্রস্তুতি নিব। ব্যাপারটা Vary করে যেমনঃ সামনে হয়ত আমার গণিত অলিম্পিয়াড, আমি তখন রোবটিক্স, কোডিং এসবের চেয়ে বেশি সময় ম্যাথে দিব। এভাবেই আসলে Maintain করে চলতে হয় নাহলে সব একসাথে করা সম্ভব হবে না।

মাহিরঃ তোমার Future Plan কি? তুমি এইযে রোবটিক্স এবং আরও অন্যান্য Extracurricular Activities এর সাথে যুক্ত আছ সব মিলিয়ে তুমি নিজেকে নিয়ে কি ভাবছ? আগামী ১০ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চাও?

ইনানঃ আমি আগেই বলেছি আমার প্রোগামিং এর প্রতি একটা Fascination আছে, আমার ভাল লাগে কোডিং করতে। Google এ একজন Web Developer, Software Engineer হিসেবে কাজ করার ইচ্ছা আছে।

"আমার প্রোগামিং এর প্রতি একটা Fascination আছে, আমার ভাল লাগে কোডিং করতে। Google এ একজন Web Developer, Software Engineer হিসেবে কাজ করার ইচ্ছা আছে। "

মাহিরঃ যেহেতু তুমি রোবটিক্স নিয়ে কাজ করেছ , তোমার একতা অভিজ্ঞতা আছে তোমার কাছে আমার পরবর্তী প্রশ্ন থাকবে দেশের Competitive Robotics এর অবস্থা কেমন মনে কর তুমি? রোবটিক্স কে বিভিন্ন Industry তে কাজে লাগানো কিংবা রোবটিক্স সাধারণ মানুষের সরাসরি কাজে লাগে হয়ত এসব ক্ষেত্রে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি। এই বিষয়ে তোমার চিন্তা কি, কিভাবে আমরা দেশে রোবটিক্স এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি?

ইনানঃ আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় Industry তে রোবটিক্স এর ব্যাবহার একটু কম, কিন্তু এর মানে এটা না যে আমাদের দেশে একেবারেই রোবটিক্স নেই। যেমনঃ Recently "বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক" একটা Development Board বের করেছে "JRC Board", যেখানে বাংলা ভাষায় কোড করা যায়। এভাবেই আমরা একটু একটু করে এগিয়ে আসছি। রোবটিক্স এর ক্ষেত্রে আমাদের যে মেধা সেটা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি যেটা আমরা প্রতি বছরই প্রমাণ করে আসছি। যেমনঃ প্রথম রোবটিক্স অলিম্পিয়াড ২০১৮ তে আমরা একটি স্বর্ণপদক পাই, পরের বছর ২০১৯ এও আমরা একটি স্বর্ণপদক পাই, ২০২০ এ ২টি স্বর্ণপদক এবং ২০২১ এ এবার আমরা ৪টি স্বর্ণপদক পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর কিন্তু অর্জনটা বেড়েই চলেছে। এবার বাংলাদেশ ৪টা ক্যাটাগরিতে অংশ নিয়ে প্রতিটিতেই স্বর্ণপদক আনে যা খুব ভাল একটি ফলাফল। জাপান, চীন, কোরিয়ার মত রোবটিক্স বিষয়ে Skilled দেশগুলোকে হারিয়ে স্বর্ণ বাংলাদেশ পাচ্ছে। এটাই নির্দেশ করছে আমাদের দেশে রোবটিক্স এ Skillful Person আছে। NAFTech, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক অনেক Industry একসাথে মিলে ভাল কিছু করার চেষ্টা করছে। এভাবে চলতে থাকলে খুব শীঘ্রই আমরা আশা করতে পারি বাংলাদেশেও "Boston Dynamics" এর মত রোবটিক্স এর প্রতিষ্ঠান থাকবে।

"জাপান, চীন, কোরিয়ার মত রোবটিক্স বিষয়ে Skilled দেশগুলোকে হারিয়ে স্বর্ণ বাংলাদেশ পাচ্ছে। এটাই নির্দেশ করছে আমাদের দেশে রোবটিক্স এ Skillful Person আছে।"

মাহিরঃ তাহলে বাংলাদেশে রোবটিক্স সেক্টর নিয়ে তুমি অনেক আশাবাদী। আমরাও আশাবাদী, আমরাও চাই এই সেক্টরটি আরও ভাল করুক। তোমার পুরো জার্নিতে কাকে দেখে কিংবা কাদের দেখে তুমি Inspired হও?

ইনানঃ আমার Inspiration বলতে কোডিং এর ক্ষেত্রে Mark Zuckerberg আমার Inspiration। যেভাবে উনি প্রতিটা Problem কে Tackle করেন, প্রতিবার নতুন Creativity এর সঙ্গে নতুন Concept চিন্তা করেন সেটা আসলেই খুব ভাল এবং Efficient। এছাড়া Larry Page হচ্ছে আমার একজন Inspiration কোন Startup কে, Business কে, হয়তো আমার একটা Software Farm আছে সেটাকে আমি কিভাবে Handle করব কিংবা আমার Employee দের কিভাবে Handle করব যেন তারা Productive হয়। এবং আমার মা আমার Inspiration কিভাবে আমি সময়কে Manage করব, একটি Balanced Way তে আমি সবকিছু করতে পারব এবং আমার Hope এর কাছে Live up করতে পারব।

মাহিরঃ এখন যারা রোবটিক্স নিয়ে কাজ করছে অথবা সামনে রোবটিক্স নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের জন্য তোমার পরামর্শ কি হবে?

ইনানঃ আসলে যে কেউই রোবটিক্স নিয়ে কাজ করতে পারে। এখানে মূল ব্যাপারটা হল শুরু করা। একবার শুরু করলে সে দেখবে জিনিসটা খুব মজার, তখন তার নিজে থেকেই রোবটিক্স এর প্রতি ভালবাসা জন্মাবে। আমার যে পরামর্শ থাকবে যারা নতুন রোবটিক্স শুরু করবে তাদের প্রতি রোবটিক্স একবার শুরু করলে "Give up" বলে কোন শব্দ তোমার Dictionary তে থাকতে পারবে না, লেগে থাকতে হবে। Robotics is all about fails. কারণ আপনি যখন শুরু করবেন আপনি হয়ত একটা ভুল কানেকশন দিলেন, ২০০ টাকা দিয়ে একটা মোটর কিনে আনলেন, তা এখুনি জ্বলে গেল, ২ মিনিটের একটা কানেকশনে তখন আবার একটা মোটর কিনে আনতে হচ্ছে। আমিও জিনিসটা ফেইস করে এসেছি, Beginning Level এ এমনটা হয়। আমার ছোট বোনও যখন শুরু করে তার সাথেও এমন হত এবং সে খুব Disheartened হয়ে যেত। আমি তাকে বলতাম, "মন খারপ কর না, তুমিও পারবে"। কেননা রোবটিক্স এর মূল ব্যাপার হল Patience থাকতে হবে, Give up করা যাবে না।

"রোবটিক্স এর মূল ব্যাপার হল Patience থাকতে হবে, Give up করা যাবে না।"

মাহিরঃ তুমি নিজেও বললে এবং আমরা আগেও শুনেছি তুমি বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে একটিভ, বিশেষ করে ম্যাথ অলিম্পিয়াডে। তুমি কি মনে কর একজন মানুষের Talent কে Shaping এর ক্ষেত্রে অলিম্পিয়াড কতটা ভুমিকা রাখে কিংবা আদৌ এর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ?

ইনানঃ অলিম্পিয়াড কিংবা Competitiveness আমার মতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমনঃ আমি যখন ইংলিশ অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন হই ঐ সময়টাতে আমি ইংলিশের অনেক কিছু জানতে পারি যেমন ধরেন IPA অর্থাৎ "International Phonetic Alphabet", এই জিনিসটা কিন্তু ইংলিশ Speaking, Pronunciation এ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমি আগে জানতাম না কিন্তু অলিম্পিয়াড করতে গিয়ে জানতে পারি। ম্যাথ অলিম্পিয়াডে অনেক অংক করা হয় যা একদম পাঠ্য বই এর বাইরের। প্রতিটা অংক আলাদা প্রিন্সিপাল ফলো করে, যা আপনাকে ম্যাথ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে। ফিজিক্স অলিম্পিয়াডেও একইভাবে আমি অনেক কিছু জানতে পারি। এটা আসলে পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে একটি নতুন জগত আবিষ্কার করা। Albert Einstein বলেন, "Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school." তাই পুঁথিগত বিদ্যাই কিন্তু সবকিছু না, এর বাইরে আমরা যা জানি সেটাই মূলত আমাদের অর্জন। অলিম্পিয়াড এক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ভুমিকা রাখে।

মাহিরঃ তোমার যে দিনদিন Progress হচ্ছে এক্ষেত্রে কোন জিনিসটি তুমি মাথায় রাখ?

ইনানঃ আসলে আমি সবসময় মনে রাখি আমাকে সবকিছুতে হতে হবে না, চেষ্টা

করাটাই বড় কথা। আমার মা সবসময় একটা কথা বলেন, “কখনও Success এর পেছনে ছুটবে না, তুমি তোমার 100% দিলে Success ই তোমার পেছনে আসবে। তাই আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার ১০০% দেয়ার, কখনো সেটা সম্ভব হয় কখনো হয় না। তাই আমি সবাইকে দোয়া করতে বলি যেন আমি আমার বেস্ট দিতে পারি সব জায়গায়।

মাহিরঃ এবার আমি যাচ্ছি জাইমার কাছে। তোমার রোবটিক্স শুরু করার জার্নিতে প্রায় সাথে সাথেই সাফল্য আসে তখন তোমার কেমন অনুভূতি হয়েছে?

জাইমাঃ It was a moment of joy. Obviously খুব খুশি ছিলাম এবং অনেক Amazed. আমার তখন কেবল ৩-৪ মাস হয়েছিল আমি শুরু করি রোবটিক্স শিখা। আমার রোবটিক্স এ Enter করার ব্যাপারটাই অনেক Unique ছিল। আমার ভাই আমার মাকে বলছিল আমার একজন টিমমেট লাগবে, আমি “বাংলাদেশ রোবটিক্স অলিম্পিয়াড” এ অংশগ্রহণ করতে চাই। তখন আমার মা বলল এই করোনাকালীন সময়ে না আমি তোমাকে কোথাও যেতে দিতে পারব, না আমাদের বসায় কাউকে আসতে দিতে পারব। ব্যাপারটা খুব Risky। তখন মায়ের কথায় ও আমাকে রোবটিক্স শেখানো শুরু করল এবং আমি আস্তে আস্তে শিখলাম। প্রথম প্রথম খুব বিরক্ত লাগবে। কারণ মোটরের কানেকশন দিতে গিয়ে মোটর পুড়ে যেতে পারে। তখন Beginner ছিলাম, নেগেতিভ আর পজিটিভ অনেক ঝামেলা করতাম। সেই সময়টাতে ভাইয়া আমাকে খুব Encourage করত। আমাকে বলত, “হার মানলে তো হবে না। দুনিয়াতে এরকম অনেক নেগেটিভ পজিটিভ বের করতে হবে”। তখন একটু সাহস পেতাম এবং আবার শিখতে শুরু করতাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় অনেক কিছু পারি। আমি যখন শুরু করি তখন ভাইয়া আমাকে “Scratch” এ বিভিন্ন জিনিস করতে বলত। আমি বলব, “Scratch is a beginning platform. It is really great for beginners.” শুরুতে ভাল না লাগলেও এখন আমি রোবটিক্স Enjoy করি। Now I have a fascination for robotics.

মাহিরঃ That’s great! তোমাদের জার্নির কথা শুনে, তোমাদের এতদূর পর্যন্ত আসার কথা শুনে আমাদের নিজেদের কাছেও Inspiring লাগছে। তোমাদের সাথে কথা বলে অনেক ভাল লাগল। হোয়াইটবোর্ড সাইন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা থাকল। আশা করি সামনেও তোমরা নিজেদের জন্য, তোমাদের পরিবারের জন্য এবং দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য।

ইনানঃ দোয়া করবেন আমাদের জন্য।

জাইমাঃ Pray for us.

মাহিরঃ অবশ্যই দোয়া থাকবে।
আশা করি সামনে আমাদের ক্লাবের অন্য কোন আয়োজনেও তোমাদের সাহযোগীতা পাব।

ইনানঃ Sure ভাইয়া।

তো, কেমন লাগলো আমাদের এইবারের আয়োজন?

তোমাদের মতামত আমাদের গুরুত্বের একদম শীর্ষে, তাই প্রিয় ম্যাগাজিনে আর কি কি দেখতে চাও জানিয়ে দাও আমাদের ইমেইলে। পাশাপাশি হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের নানা আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে চোখ রাখো আমাদের ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে! দেখা হচ্ছে পরের সংখ্যায়, ততদিন পর্যন্ত, বিদায়!

ইমেইলঃ whiteorigins.wbsc@gmail.com
ফেসবুক পেজঃ
https://www.facebook.com/whiteboardscienceclub/

নভেম্বর-ডিসেম্বর
২০২১

হোয়াইটবোর্ড সায়েন্স ক্লাবের দ্বিমাসিক বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিন

হোয়াইট অরিজিন্স

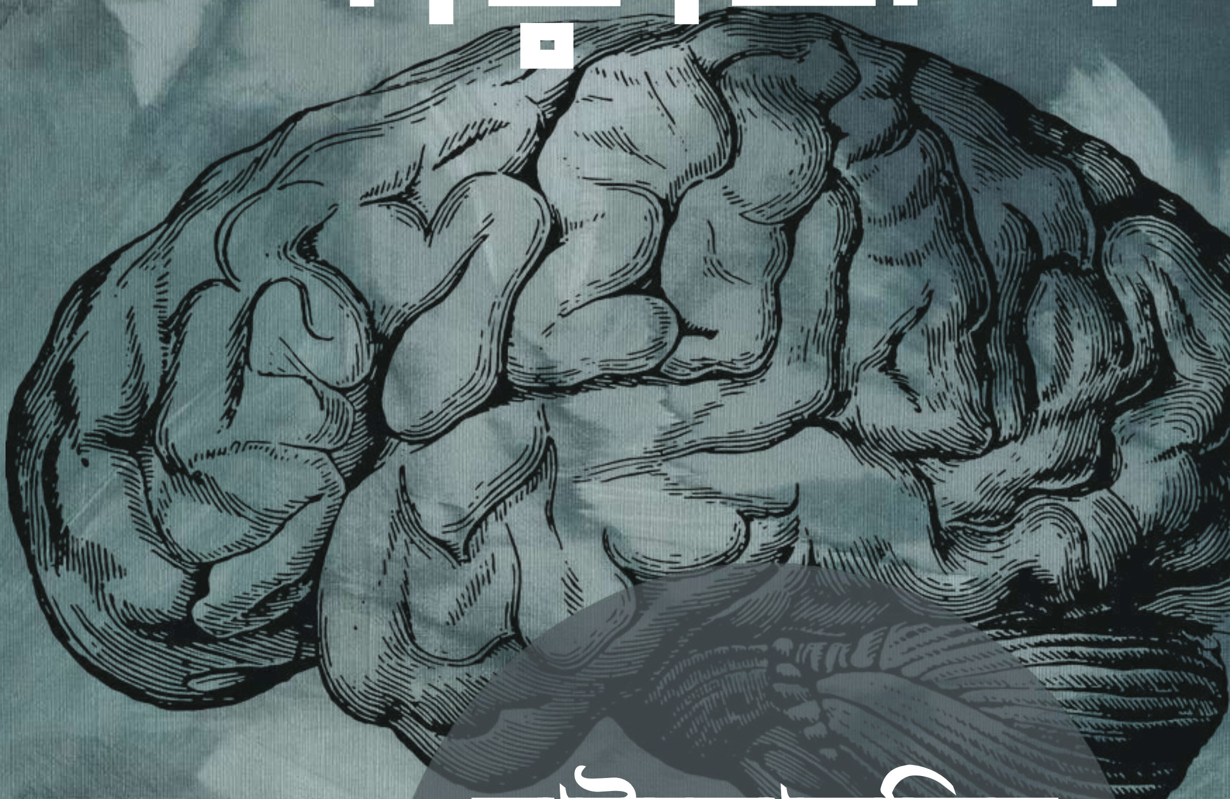

সাইকোলজির আদ্যোপান্ত

মনোবিজ্ঞান

- টেরারিয়াম এ তৈরি ছোট্ট এক পৃথিবী
- সিনড্রোমস্ ও মিথস্
- মাল্টিভার্স
- ইন্টারন্যাশনাল রোবোটিক্স অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক বিজয়ীদের সাক্ষাৎকার
- বিজ্ঞানছড়া, কি, কেন ও কিভাবে, বিজ্ঞান বুলেটিন, ফিচার আর্টিকেলসহ আরো অনেক কিছু!